রাতের অতিথি

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পি, সি, সরকার এণ্ড কোং
২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

উৎসর্গ

মানস, বেণু, সীতু, বেণু, রেণু, শাণু, কণা, ভানু, কানু,
বীথি, উমা, আতু, টুনু, নালু, সুলেখা, নচু,
বিন্দু, তোতা, বাণী, ভল্লু
মুচি, টুল্‌টুল্ +

এই বইয়ে আছে

"At the four corners of a child's bed stand
Perseus and Roland, Sigurd and St. George."

The Red Angel—G. K. C.

বনের বিহঙ্গ

কঙ্ক ব্যাধের পুত্র। সে অনার্য্য; নিকশ পাথরের মত কালো সুঠাম তাহার দেহ—বেত্রের মত ঋজু অথচ সাবলীল, নিটোল অথচ ক্ষীণ। কৃষ্ণসারের মত দুটি চোখ; মাথার ঝামর কেশ পুষ্পিত লতা দিয়া পিছনে বাঁধা; হাতে ধনুঃশর। কঙ্কের বয়স তের বৎসর।

উজ্জয়িনী হইতে পনের দিনের পথ দূরে, অবন্তীরাজ্যের সীমানার বাহিরে একটি ছোট গ্রামে সে থাকে। গ্রামে সকল জাতির লোকই বাস করে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, জালিক, নিষাদ; অধিকাংশই কৃষিজীবী। এই গ্রামের এক কিনারায় বৃদ্ধ শমী বৃক্ষ যেখানে গ্রামের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে—সেইখানে কঙ্কের ঘর। তাহার কেহ নাই; বাপ ছিল, সেও সম্প্রতি শিকার করিতে গিয়া চিত্রব্যাঘ্রের আক্রমণে প্রাণ হারাইয়াছে। কঙ্ক একা। বনে ফাঁদ

পাতিয়া সে ময়ূর, বন কপোত, শশক ধরিয়া আনে ; কখনও বা হরিণ মারিয়া আনিয়া বিক্রয় করে। এই তার জীবিকা।

বন-জঙ্গল ছাড়া পৃথিবীতে একজনকে কঙ্ক ভালবাসে,—সে ক্ষত্রিয় বসুদত্তের মেয়ে রত্না। রত্না কঙ্কের চেয়ে দুই-তিন বছরের বড় ; কিন্তু দুইজনের মধ্যে ভারি ভাব। রত্নারও ভাই-বোন কেহ নাই, তাই সে কঙ্ককে ছোট ভায়ের মত ভাল বাসে;—সূক্ষ্ম সূতা দিয়া তাহার পাখী ধরিবার ফাঁদ তৈয়ার করিয়া দেয়, নিজের চুল বিনাইয়া কঙ্কের ধনুকের ছিলা প্রস্তুত করে। কঙ্কও বন হইতে হরিণ শিশু ধরিয়া আনিয়া রত্নাকে দেয়, কত রকমের পাখী লইয়া আসে ; বনের মধ্যে যাহা কিছু বিচিত্র বা নূতন পায় তাহাই রত্নার জন্য সংগ্রহ করিয়া আনে।

কখনো, গাছের ছায়ায় ঘাসের উপর শুইয়া, বনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কঙ্ক বলে,—রত্না, তোর যখন রাজার ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে, তুই যখন নগরে গিয়ে রাজ প্রাসাদে থাকবি, তখন আমি কি করব।'

রত্না মনে জানে সে গরীবের মেয়ে, রাজপুত্রের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতে পারে না ; তবু বলে,—'তুইও আমার সঙ্গে থাকবি। এখানে আমরা যেমন আছি রাজ প্রাসাদেও তেমনি থাকব। পারবি না ?'

কঙ্ক চুপ করিয়া থাকে, জবাব দিতে পারে না। তাহার মনটা উদাস হইয়া যায়।

এমনি ভাবে দিন কাটে।

একদিন,—তখন শরৎ কাল—কঙ্ক পাঁচ দিন পরে বন হইতে গ্রামে ফিরিয়া আসিল। এবার সে কিছুই শিকার করিয়া আনিতে পারে নাই, কেবল তাহার বাম হাতের প্রকোষ্ঠের উপর একটি অপরূপ পাখী। পাখীর পালকের রঙ্ দুধের মত শাদা, বাঁকা ঠোঁট পাকা লঙ্কার মত লাল, মাথায় সবুজ রঙের ঝুঁটি। পাখীর পায়ের সঙ্গে কঙ্কের আঙ্গুলে সূতা দিয়া বাঁধা—সে মাঝে মাঝে উড়িয়া পালাইবার চেষ্টা করিতেছে, আবার বাধা পাইয়া কঙ্কের মনিবন্ধের উপর আসিয়া বসিতেছে।

কঙ্ক নিজের গৃহে গেলনা, একেবারে বসুদত্তের দ্বারে উপস্থিত হইল। দেখিল প্রৌঢ় বসুদত্ত দ্বারের সম্মুখে বসিয়া শূন্যদৃষ্টিতে দূরের পানে তাকাইয়া আছেন।

জিজ্ঞাসা করিল,—'রট্টা কোথায় ?'

বসুদত্ত দৃষ্টিহীন চক্ষু ফিরাইয়া কঙ্কের দিকে চাহিল, তারপর বলিলেন' —'রট্টা নেই।'

'রট্টা নেই'—কঙ্কের হাত হইতে ধনুঃশর পড়িয়া গেল,— 'কোথায় গিয়েছে ?'

বসুদত্তের মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, যে পথটি বনের ভিতর দিয়া উজ্জয়িনীর দিকে চলিয়া গিয়াছে—তিনি নীরবে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সেই পথ দেখাইয়া দিলেন।

কঙ্ক কিছু বুঝিতে পারিল না, বলিল,—'ও পথ ত উজ্জয়িনী গিয়েছে।'

বসুদত্তের নিষ্প্রভ চক্ষু সহসা জ্বলিয়া উঠিল, বলিলেন,—'হুঁ—রট্টাও উজ্জয়িনী গিয়েছে। উজ্জয়িনীর রাজকুমার তাকে হরণ করে নিয়ে গেছে। আমি অক্ষম—তাকে ধরে রাখতে পারলাম না।' কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি কঙ্কের দিকে ফিরিয়া বলিলেন .—'কঙ্ক, তুই রট্টাকে ভালবাসিস ?'

কঙ্ক ঘাড় নাড়িল।

বসুদত্ত বলিলেন,—তবে তুই এর প্রতিশোধ নে ; আমি বৃদ্ধ, আমার বাহুতে শক্তি নেই,—আমি পারব না।—তুই তীর ছুঁড়তে পারিস ?'

কঙ্ক মাটি হইতে ধনুঃশর তুলিয়া লইল। সম্মুখেই একটি উচ্চ আমলকী বৃক্ষে ফল ফলিয়াছিল, কঙ্ক লক্ষ্য স্থির করিয়া তীর ছুঁড়িল,—তীর বিদ্ধ ফল বসুদত্তের পায়ের কাছে পড়িল।

বসুদত্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভীষণস্বরে বলিলেন,—'কঙ্ক ; তুই পারবি। ভিতরে আয়, সব কথা বলি।'

গৃহের ভিতরে গিয়া, কঙ্ককে সম্মুখে বসাইয়া বসুদত্ত বলিতে লাগিলেন, 'চারদিন আগে সন্ধ্যার সময় এক ক্ষত্রিয় যুবক ঘোড়ায় চড়ে আমার দ্বারে এসে দাঁড়াল। তার সুন্দর চেহারা, কিন্তু বেশভূষা সাধারণ লোকের মত। জিজ্ঞাসা করলাম,—কি চাও ? সে বললে,—আজ রাত্রির জন্য অতিথি হতে চাই।

'আমি তাকে ঘোড়া থেকে নামতে বললাম। সে ঘোড়া থেকে নামল, রট্টা এসে তার ঘোড়া নিয়ে গেল। অতিথির সেবা করা

মেয়েদের কাজ, রট্টা যথারীতি অতিথির সেবা করলে। রাত্রে আহারাদির পর আমি অতিথির পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম। সে বললে,—আমি ক্ষত্রিয়, দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছি—এর বেশী কোনো পরিচয় নেই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—তোমার দেশ কোথায় ?

'সে বললে—উজ্জয়িনী।

'আমি বললাম—উজ্জয়িনীর রাজা মহা পাষাণ্ড !

'অতিথি চমকে উঠে বললে,—আপনি জানেন না—তিনি মহাধার্ম্মিক।

'আমি বল্‌লাম,—তিনি আমাকে বিনা দোষে রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত করেছিলেন—সে আজ বিশ বছরের কথা। তারই ফলে আমি আজ দরিদ্র—কৃষিজীবী।

'অতিথি আর কোনো কথা বললে না। পরদিন সকালে তার বিদায় হবার কথা, কিন্তু সে বিদায় হল না। আমিও অতিথিকে তাড়িয়ে দিতে পারলাম না।

'দুপুরে বেলা মাঠ থেকে ফিরে এসে দেখ্‌লাম তার ঘোড়া দ্বারের সামনে বাঁধা রয়েছে। বাড়ীতে প্রবেশ করতেই সে এসে বললে—আমি আপনার মেয়ে রট্টাকে বিয়ে করতে চাই, আপনি তাকে আমার হাতে দান করুণ।

'আমি বল্‌লাম—আমি তোমার হাতে রট্টাকে দেব না।

'সে বললে—কেন ? আমি ক্ষত্রিয়, আমি নিতান্ত দরিদ্র নই—

'আমি বললাম,—তুমি যদি উজ্জয়িনীর মহারাজও হও, তবু তোমার হাতে মেয়ে দেব না।

'সে মৃদু হেসে বললে—আর যদি উজ্জয়িনীর রাজকুমার হই ?

'—তবু না।

'—তবে শুনুন; আমি উজ্জয়িনীর রাজ পুত্র। মহারাজ আমার হাতে রাজ্যভার দিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে চান; তাই রাজদণ্ড গ্রহণ করবার আগে আমি দেশভ্রমণ করে বেড়াচ্ছি। আমি রট্টাকে আমার মহিষী করতে চাই—নতজানু হয়ে আপনার অনুমতি চাইছি।

'রট্টাও অদূরে হেঁটমুখে দাঁড়িয়ে ছিল, আমি তাকে সেখানথেকে চলে যেতে বল্‌লাম। সে আস্তে আস্তে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

'তখন আমি বল্‌লাম—তুমি এখনি আমার গৃহ থেকে দূর হও। তুমি আতিথ্যের অবমাননা করেছ। আমি রট্টাকে স্বহস্তে হত্যা করব তবু তোমার হাতে দেব না।

'সে উঠে দাড়াল—বেশ, তবে আমি নিজেই তাকে গ্রহণ করলাম।—এই বলে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'আমি বাইরে এসে দেখলাম; রট্টাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে সে নক্ষত্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে।

'তীর ধনুক আন্‌তে আবার ঘরের মধ্যে ছুটে এলাম; ফিরে গিয়ে দেখি রট্টাকে নিয়ে সে বনের পথে অদৃশ্য হয়ে গেছে। বসুদত্ত নীরব হইলেন। কঙ্ক নতমুখে বসিয়া রহিল। দীর্ঘকাল

পরে ভগ্নস্বরে বসুদত্ত বসিলেন,—'কঙ্ক, আমি বৃদ্ধ—আমার পেশীতে শক্তি নেই, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ তুই যদি রট্টাকে ভালবাসিস্ তবে এর প্রতিশোধ নে।

কঙ্ক মুখ তুলিল, বলিল,—কি করতে হবে ?

বসুদত্ত নিজের তূণীর হইতে দুইটি তীর বাহির করিয়া কঙ্ককে দিলেন, বলিলেন,—'তুই উজ্জয়িনী যা, যে রট্টাকে হরণ করে নিয়ে গেছে, একটী তীর তার জন্যে আর—

—'আর ?'

'অন্যটি রট্টার জন্যে'—বলিয়া বসুদত্ত অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। কঙ্ক সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল,—রট্টাকে ফিরিয়ে আন্‌ব না ? 'না, সে পিতৃদ্রোহিনী তাকে ফিরিয়ে আনিস্ না বলিয়া বসুদত্ত দ্রুতপদে সেস্থান ছাড়িয়া গেলেন।

এক হাতে পাখী, অন্য হাতে ধনুঃশর—কঙ্ক একদিন সকাল বেলা উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইল। পাখীটি এই একপক্ষ সময়ের মধ্যে বেশ পোষ মানিয়াছে ; এখন আর তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে হয় না, সে আপনি উড়িয়া যায় আবার আপনি ফিরিয়া আসিয়া কঙ্কের কাঁধে বসে। কঙ্ক তাহাকে বুলি শিখাইয়াছে, সে কেবল বলে—রট্টা ! রট্টা ! রট্টা !

এই কয়দিন বনের ভিতর দিয়া আসিতে আসিতে কঙ্ক কেবল রট্টার কথাই ভাবিয়াছে। রট্টাকে যে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে তাহাকে বধ করিতে হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু

রট্টাকেও মারিয়া ফেলিতে হইবে এমন আদেশ বসুদত্ত কেন দিলেন ?

অনেক ভাবিয়া কঙ্ক স্থির করিল যে রট্টাকে মারিবার প্রয়োজন নাই ; বসুদত্ত বলিয়াছেন রট্টাকে ফিরাইয়া আনিস্ না। বেশ, তাহাই হইবে ! রট্টার হরণকারীকে বধ করিয়া সে রট্টাকে লইয়া বনে ফিরিয়া যাইবে—দুজনে বনের মধ্যে থাকিবে, একসঙ্গে শিকার করিবে, আর গ্রামে ফিরিবে না। তাহা হইলেইত বসুদত্তের আদেশ রক্ষা করা হইবে।

কঙ্ক বনের প্রাণী, কখনও নগর দেখে নাই ; উজ্জয়িনীর মত জনাকীর্ণ নগরে আসিয়া সে যেন দিশাহারা হইয়া গেল। চারিদিকে বড় বড় অট্টালিকা, কারুকার্য্যমণ্ডিত উচ্চ মন্দির, সুরম্য উদ্যান,—দেখিয়া কঙ্কের মাথা ঘুরিয়া গেল। এত বড় স্থানে, এত লোকের মধ্য হইতে সে রট্টাকে কেমন করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিবে ?

পথ চলিতে চলিতে কঙ্ক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—'রট্টা কোথায়। তোমরা জানো ?—রট্টাকে কেউ দেখেছ ?—খুব সুন্দর মেয়ে, চিবুকে কালো তিল আছে—রট্টাকে তোমরা কেউ চেনো না ?

সকলে হাসে, রট্টার সংবাদ কেহ দিতে পারে না। কেহ কেহ বলে—'জংলী ছেলে, রট্টাকে আমরা চিনিনা। তোর পাখীটা ভারি সুন্দর—বিক্রি করবি ?'

কঙ্ক পাখী বিক্রয় করেনা। এ পাখী যে রট্টার জন্য আনিয়াছে—কি করিয়া বিক্রয় করিবে ?

ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে রাজ প্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া একটা কথা হঠাৎ কঙ্কের স্মরণ হইল—রাজপুত্রের খোঁজ লইলেই রট্টার সন্ধান মিলিবে। সে শূলধারী প্রতীহারীকে জিজ্ঞাসা করিল,—'রাজকুমার কোথায় ?'

প্রতীহারী বলিল,—'রাজকুমার এখন উজ্জয়িনীতে নেই।'

—'কোথায় গিয়েছেন ?'

—'তিনি এখন নব পরিণীতা বধূ-দেবীকে নিয়ে শৈল দুর্গে বিরাজ করছেন।'

—'শৈল-দুর্গ কোথায় ?'

প্রতীহারী সন্দিগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'তুই কি চাস্ ?,

কঙ্ক বলিল,—'আমি নব-পরিণীতা বধূ-দেবীর জন্যে পাখী এনেছি,—রাজকুমারকে বিক্রি করব।'

প্রতীহারী তখন পথ বলিয়া দিল ;—নগরের বাহিরে, রেবার তীরে, টিলার মাথায় শৈলদুর্গ আছে, সেখানে রট্টাদেবী আর কুমার আনন্দে বাস করিতেছেন !

তখন দক্ষিণ তোরণপথে নগর হইতে বাহির হইয়া কঙ্ক রেবার তীর ধরিয়া চলিল। চলিতে চলিতে মধ্যাহ্ন কাটিয়া গেল ; ক্ষুধার উদ্রেক হইলে কঙ্ক অঞ্জলি ভরিয়া রেবার জল পান করিয়া আবার চলিতে লাগিল। এইরূপে শৈলদুর্গের নিকটে যখন উপস্থিত হইল তখন রেবার জল অস্তমান সূর্য্যের আলোয় রাঙা হইয়া টল্‌টল্ করিতেছে। রেবার জল হইতেই ছোট একটি পাহাড়

মাথা তুলিয়া আছে, তাহার চূড়ায় শৈলদুর্গ,—দেখিলে মনে হয় যেন নদী এই দুর্গটির পা ধোয়াইয়া দিতেছে।

পাহাড়ের উপরে উঠিবার একটিমাত্র পথ; তাহার মুখে প্রহরীর ঘাঁটি বসিয়াছে। কঙ্ক উপরে যাইতে চাহিল, কিন্তু প্রহরীরা তাহাকে যাইতে দিল না; বলিল,—'এখন কুমারের সঙ্গে দেখা হবে না; কাল সকালে আসিস্।'

কঙ্ক অনেক মিনতি করিল কিন্তু প্রহরীরা পথ ছাড়িয়া দিল না।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। কঙ্ক শৈল্যদুর্গের পাদমূল চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিল, কোথাও উপরে উঠিবার পথ নাই; কর্কশ, নগ্ন, পাহাড় সোজা উর্দ্ধদিকে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে যে পাহাড় অলঙ্ঘনীয়, কঙ্কের পক্ষে তাহা অলঙ্ঘনীয় নয়। অনেক খুঁজিয়া খুঁজিয়া কঙ্ক দেখিল নদীর দিকে একটা স্থানে পাহাড় তেমন খাড়া নয়, মাঝে মাঝে পা রাখিবার জায়গা আছে—চেষ্টা করিলে উঠিতে পারা যায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকিয়া কঙ্ক উঠিতে আরম্ভ করিল।

অনেক কষ্টে অনেকবার পা ফস্কাইয়া কঙ্ক যখন উপরে উঠিল—তখন পূর্ব্বাকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়াছে,—নিম্নের শিলা-সঙ্কুল দৃশ্য যেন কুয়াশায় আব্ছায়া হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পাহাড়ের উপরে উঠিয়াও কঙ্ক বিশেষ সুবিধা করিতে পারিল না—সম্মুখেই বিশহাত উঁচু দুর্গপ্রাচীর! দুর্গদ্বার দিয়া প্রবেশের চেষ্টা করিলে

সেখানকার রক্ষীরা ধরিয়া ফেলিবে, অথচ প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া দুর্গে প্রবেশ করা অসম্ভব। এখন উপায় !

চক্রাকৃতি প্রাচীরের তলা দিয়া শিকারীর মত সন্তর্পণে কঙ্ক চালিতে লাগিল। এক সময় মুখ তুলিয়া দেখিল, ঠিক প্রাচীরের উপরেই একটি প্রাসাদের শুভ্র দেয়াল চাঁদের আলোয় ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। দেয়ালের গায়ে একটি মুক্ত বাতায়ন, সেই বাতায়ন দিয়া দীপের আলো বাহিরে আসিতেছে। কঙ্ক দূরে সরিয়া গিয়া, ভিতরে কি আছে দেখিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু কিছু দেখিতে পাইলনা।

হঠাৎ এই সময় পিছন হইতে একটা পেচক ডাকিয়া উঠিল। কঙ্কের পাখী তাহার কাঁধের উপর বসিয়া ছিল, পেচকের চীৎকারে ভয় পাইয়া সে উড়িয়া গেল। পাখা ঝট্‌পট্ করিতে করিতে প্রাকারের গায়ে গিয়া পড়িল তারপর একবার 'রট্টা' বলিয়া ডাকিয়া মুক্ত জানালা-পথে কক্ষের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ক্ষণকাল পরে একটি মুখ বাতায়নে দেখা দিল, সেই মুখ দেখিয়া কঙ্কের বুকের রক্ত নাচিয়া উঠিল। সে কোনোমতে উত্তেজনা দমন করিয়া চাপা গলায় ডাকিল,—'রট্টা !'

রট্টা নীচের দিকে সবিস্ময়ে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—'কে ?'

—'আমি কঙ্ক !'

রট্টা আনন্দে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল,—'কঙ্ক ভাই ! তুই এসেছিস ?—আমি জানতাম। ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ? শীঘ্র ভিতরে আয়।'

—'কোন্ পথে যাব ?'

—'কেন, দুর্গের তোরণ দিয়ে।'

—'প্রহরীরা যেতে দেবে না। আমি পাহাড়ের গা বেয়ে উঠেছি। রট্টা, তুই জানালা দিয়ে একটা দড়ি ফেলে দে, আমি এখনি তোর কাছে যাচ্চি।'

রট্টা হাসিয়া বলিল,—'আচ্ছা।' তারপর নিজের দেহ হইতে উত্তরীয় খুলিয়া তাহার একটা প্রান্ত নীচে ফেলিয়া দিল। মুহূর্ত মধ্যে কঙ্ক সেই উত্তরীয় ধরিয়া উপরে উঠিয়া রট্টার ঘরে প্রবেশ করিল।

রট্টার ঘর দেখিয়া কঙ্ক অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। ঘরের মেঝে মনিমুক্তার কাজ করা, সোনার শিকল দিয়া ছাদ হইতে স্ফটিক দীপ ঝুলিতেছে, গজদন্তের পালঙ্কের উপর শুভ্র শয্যা পাতা—তাহার চারিধারে মোতির ঝালর।

রট্টা আহ্লাদে কঙ্ককে হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া পালঙ্কে বসাইল, বলিল,—'কঙ্ক ভাই, তুই তাহলে আমাকে ভুলে যাস্‌নি ? চলে আসবার সময় তোকে দেখতে না পেয়ে বড় দুঃখ হয়েছিল। তুই কি করে এখানে এলি ?—গাঁয়ের সকলে কেমন আছে ? —বাবা কেমন আছেন ?'

রট্টা বাবার কথা জিজ্ঞাসা করিতেই কঙ্কের মনে পড়িল কোন্ উদ্দেশ্য লইয়া সে উজ্জয়িনীতে আসিয়াছে। ধনুক কাঁধেই ছিল, হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল,—'রট্টা, যে তোকে হরণ করে এনেছে সে কোথায় ?'

রট্টার চোখে ভয়ের ছায়া পড়িল, সে বলিল,—'কেন? তাঁকে কি দরকার?'

দাঁতে দাঁত চাপিয়া কঙ্ক বলিল,—'তাকে আমি চাই—তাকে—'

এই সময় একটি সুন্দর কান্তি যুবাপুরুষ কক্ষে প্রবেশ. করিলেন। কঙ্ককে দেখিয়া বলিলেন,—'এ কে'

রট্টা বলিল,—'ও আমার ভাই কঙ্ক; তোমাকে ওর কথা বলেছি।'

'তুমিই কঙ্ক?'—যুবক হাস্যমুখে তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন।

কঙ্ক বলিল,—'দাঁড়াও। তুমি রট্টাকে জোর করে ধরে এনেছ?'

যুবক হাসিয়া বলিলেন,—'অপরাধ স্বীকার করছি।'

'তবে দাঁড়াও'—বলিয়া কঙ্ক ধনুকে শরসংযোগ করিল।

রট্টা ভীত স্বরে কহিল,—'কঙ্ক, ও কি করছিস? উনি যে আমার স্বামী! তুই কি পাগল হলি?'

কঙ্কের দুই চক্ষু জ্বলিতে লাগিল, সে বলিল,—'বসুদত্তের আদেশ, যে তোকে হরণ করেছে তাকে হত্যা করতে হবে।' বলিয়া ধনুক তুলিল।

রট্টা ছুটিয়া গিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইল, বলিল,—'তবে আমাদের দু'জনকেই একসঙ্গে হত্যা কর্।—বাবার আদেশ?

কঙ্ক, তুই জানিস না, বাবার কাছে দূত গিয়েছে, তাঁর নির্ব্বাসন দণ্ড প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাঁকে মহারাজ উজ্জয়িণীর মহাদণ্ডনায়ক নিযুক্ত করেছেন—'

কঙ্ক বলিল,—'আমি তা জানিনা—বসুদত্তের আদেশ যে তোকে—'

রট্টা কাঁদিয়া বলিল,—'বেশ, তবে আমাকে আগে হত্যা কর; তোর বোনের বুকে আগে তীর বিঁধে দে!'

রট্টার জন্যও বসুদত্ত একটা তীর দিয়াছিলেন, কিন্তু সেকথা কঙ্কের মনে পড়িল না। তাহার বুকের মধ্যে রোদনের উচ্ছ্বাস গুমরিয়া উঠিল, শিথিল হস্ত হইতে ধনুক খসিয়া পড়িল। সে কিছুক্ষণ অসহায়ের মত চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলিল,—'রট্টা, তুই সুখে আছিস?'

রট্টা নীরবে ঘাড় নাড়িল।

—'ও তোকে কোনো কষ্ট দেয় না?'

সজলচক্ষে হাসিয়া রট্টা বলিল,—'না, কষ্ট দেন না।'

—'তোর গাঁয়ে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না?'

—'না।'

একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কঙ্ক যুবাপুরুষকে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন করিল,—'তুমি রট্টাকে ভালবাসো?'

যুবক স্মিতমুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—'হাঁ।'

—'চিরদিন ভালবাসবে?'

হাঁ—বাস্‌ব।'

—'কখনো কষ্ট দেবেনা?'

—'না।'

কঙ্ক ক্ষণকাল হেঁটমুখে থাকিয়া মুখে একটু হাসি টানিয়া বলিল,—'আচ্ছা, তাহলে তোমাকে মারব না।'

রট্টা ছুটিয়া আসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—'কঙ্ক ভাই!'

এই সময় পাখীটা বলিয়া উঠিল,—'রট্টা! রট্টা! রট্টা!'

সকলে চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল, পাখীটা পালঙ্কের শিথানের উপর বসিয়া আছে। কঙ্ক গিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিল, তারপর রাজকুমারের হাতে দিয়া বলিল,—'এই পাখীটা রট্টার জন্য জঙ্গল থেকে ধরে এনেছিলাম—তোমাকে দিলাম।'

অপরূপ পাখী দেখিয়া দুইজনে খুব আহ্লাদিত হইলেন। রাজকুমার রট্টাকে বলিলেন,—'রট্টা, কঙ্ককে ছাড়া হবে না, ও আমাদের কাছেই থাকবে।'

রট্টা বলিল,—'হাঁ, আমারও তাই ইচ্ছা। বাবাও আস্‌বেন; বেশ হবে, সকলে উজ্জয়িনীতে থাক্‌ব।'

কুমার বলিলেন,—'সেই ভাল। কঙ্ক যে রকম বীর, ওকে আমি আমার প্রধান্ শিকারী নিযুক্ত কর্‌লাম। কি বল কঙ্ক, পারবে ত?'

কিন্তু কঙ্ক কোথায়? দুইজনে ফিরিয়া দেখিলেন—ঘরে কঙ্ক

নাই। সে যেপথে আসিয়াছিল সেই পথ দিয়া নিঃশব্দে নামিয়া গিয়াছে।

সে বনের বিহঙ্গ—তাই রট্টা আজ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

কে জানে—হয়ত বনে বনে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন রট্টার জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিবে, তখন আবার উজ্জয়িনীতে আসিয়া সে রট্টাকে দেখিয়া যাইবে। হয়ত আবার একটি অপরূপ পাখী উপহার দিয়া যাইবে।

কিন্তু চিরজীবনের জন্য পায়ে শৃঙ্খল পরিতে পারিবে না।

পিণ্টু

আমার একটা দু'নলা বন্দুক আছে। বারো বোরের বন্দুক, —ব্রীচ্-লোডিং—অর্থাৎ গাদা বন্দুক নয়। দিশী মিস্ত্রী এই বন্দুক তৈরী করেছে—কিন্তু এত সুন্দর জিনিষ যে বিলিতি বন্দুকের চেয়ে কোনো অংশে খারাপ নয়। দেড়শ' গজ পর্য্যন্ত তার পাল্লা —point blank—এ দিয়ে স্বচ্ছন্দে হাঁস মারা যায়, যদিও এটা হাঁস-মারা বন্দুক—duck gun—নয়। এই বন্দুকটি আমার বড় প্রিয়।

পাখী শিকার করতে আমি বড় ভালবাসতুম। শীত কালে যখন খালে বিলে নানা জাতের হাঁস পড়তে আরম্ভ করত তখন আমি বন্দুক কাঁধে করে বার হতুম। সে সময় আমার সঙ্গী থাকত কেবল আমার কুকুর,—পিণ্টু। পিণ্টু খাঁটি দিশি কুকুর,—তার গায়ে এক ফোঁটাও বিলিতি রক্ত ছিলনা,—ইচ্ছে করলে তোমরা তাকে নেড়ি কুত্তাও বল্‌তে পার। তার চেহারাটি ছিল রোগা, গায়ে শাদা কালো ছাপ, মুখটি ছুঁচোলো, চোখে একটি লজ্জিত সঙ্কুচিত ভাব। সত্যি কথা বল্‌তে কি, পিণ্টু খুব সাহসী কুকুর ছিলনা; ভিনপাড়া দিয়ে যাবার সময় তার ল্যাজটি অলক্ষিতে পিছনের পা দুটির ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করত, আর পাড়ার কুকুর গুলো যখন ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে আস্‌ত তখন সে কেবলি আমার পাশে ঘেঁষে ঘেঁষে আসত, আর গলার মধ্যে 'গর্‌র্‌' শব্দ করত।

দাদা বলতেন, শুধু দুধভাত খেয়ে খেয়েই পিণ্টুর সব সাহস মিইয়ে গেছে। কিন্তু সে যাই হোক, পিণ্টুর একটি অসাধারণ গুণ ছিল; সে খুব ভাল মরা পাখী উদ্ধার করতে পারত। গুলি খেয়ে উড়ন্ত পাখী যেখানেই পড়ুক—জলে স্থলে কিম্বা পাঁকের মধ্যে—পিণ্ট ঠিক তাকে মুখে করে নিয়ে আসবে। ইংরিজিতে এই জাতের কুকুরকে বলে retriever। একবার এক সাহেব পিণ্টুর আশ্চর্য্য গুণপনা দেখে দুশো টাকা দিয়ে আমার কাছ থেকে কিনে নিতে চেয়েছিল। আমি দিইনি।

যাহোক, শীতকাল এলেই আমরা দু'জনে শিকারে বার হতুম। এমন অনেকবার হয়েছে যে, পাখীর সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে বাড়ী থেকে অনেক দূর চলে গিয়াছি, দু'তিন দিন বাড়ী ফেরাই হলনা। আমার শিকারের সখ বাড়ীর সকলে জানতেন, তাই উদ্বিগ্ন হতেন না।

গত বছর শিকার করতে গিয়ে কি ব্যাপার হয়েছিল সেই কথাই আজ বলব।

খবর পেলুম, শহর থেকে মাইল কুড়ি দূরে যে জলা আছে তাতে বিস্তর হাঁস পড়েছে; হাঁসগুলো আশে পাশের ধানক্ষেতের ক্ষতি করছে। মন উৎসুক হয়ে উঠ্‌ল। অঘ্রাণ মাস,—বেশ শীত পড়েছে,—একদিন সকালবেলা পিণ্টুকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। অজ পাড়াগাঁয়ে গাড়ী যাবার রাস্তা নেই—যেতে হলে এক গরুর গাড়ী চড়ে যেতে হয়। আমরা পায়ে হেঁটেই গেলুম,

কারণ গরুর গাড়ী চড়ে কাঁচা রাস্তার ওপর দিয়ে বিশ মাইল যাওয়ার চেয়ে হেঁটে যাওয়া ঢের বেশী স্বাস্থ্যকর। অন্তত হাড়গুলো আস্ত থাকে।

জলার নিকটবর্ত্তি গ্রামে গিয়ে যখন পৌঁছুলুম তখন সন্ধ্যা হয় হয়—পশ্চিম আকাশের একটুখানি সোনালি আলো ঝিলমিল করছে। দূর থেকেই অসংখ্য হাঁসের কলকণ্ঠ শুন্‌তে পাচ্ছিলুম। হাঁসের ডাক সকলের ভাল লাগে কিনা বলতে পারিনা কিন্তু আমার বড় মিষ্ট লাগে। দেহের ক্লান্তি সত্ত্বেও মনটা আনন্দে নেচে উঠ্‌ল। পিণ্ট ও আমাকে ঘিরে আনন্দে নাচ্‌তে লাগল আর ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে লাগল।

গ্রামে বেশীর ভাগই নিম্নশ্রেণীর লোকের বাস কিন্তু একটি ছোট্ট পোষ্ট আফিস্ ছিল। তারই পোষ্টমাষ্টারের বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করলুম। তিনি ভারি ভদ্রলোক—গরম চা এবং প্রচুর জলখাবার দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। গরম গরম খাদ্যদ্রব্য পেটে পড়তেই শরীর বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠ্‌ল।

নানারকম কথাবার্ত্তায় ক্রমে রাত্রি হয়ে গেল, পূবের আকাশ উদ্ভাসিত করে পূর্ণিমার চাঁদ উঠ্‌ল। আমি তখন পোষ্টমাষ্টার বাবুকে বললুম,—'এবার বেরুনো যাক। কোন্ দিক দিয়ে গেলে সহজে জলায় পৌঁছুনো যাবে আমাকে দেখিয়ে দিন।'

আমার কাঁধে বন্দুক দেখেই পোষ্ট মাষ্টার বুঝেছিলেন যে আমি শিকার করতে এসেছি কিন্তু আমি সে রাত্রেই পাখী মারতে বেরুব

তা তিনি বুঝতে পারেন নি। তিনি আশ্চর্য্য হয়ে বললেন,—'রাত্তিরে পাখী মারতে যাবেন?'

আমি বললুম,—'হ্যাঁ—রাত্তিরেইত পাখী মারবার সুবিধা,—দেখচেন না, কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে।'

পোষ্টমাষ্টার একটু ভয়ে-ভয়ে বললেন,—'কিন্তু রাত্তিরে জলার দিকে যাবেন? সন্ধ্যার পর ওদিকে কেউ যায় না।'

'সেকি! কেন?'

তিনি কুণ্ঠিত ভাবে বললেন,—'কি জানি মশায়, আমি চোখে কিছু দেখিনি। শুনতে পাই জলায় নাকি অপদেবতা আছেন।'

আমি হেসে উঠ্‌লুম,—'অপদেবতা! সে আবার কি?'

তিনি বললেন,—'তা জানিনে মশাই, তবে শুনেছি শরবনের মধ্যে নাকি পেত্নী আছে।'

আমি হাসতে লাগলুম, বললুম,—'তা থাক পেত্নী। আমার হাতে বন্দুক আছে দেখলে সে নিজেই ভয়ে পালিয়ে যাবে।'

তিনি মাথা নেড়ে বললেন,—'যাওয়া বোধহয় উচিত নয়। একবার এক সায়েব আপনারই মত রাত্তিরে জলায় শিকার করতে গিয়েছিল, সে আর ফিরে আসেনি।'

আমি বললুম,—'কোনো ভয় সেই—আমি এগারোটার মধ্যেই ফিরে আসব। আপনি শুধু আমায় পথটা দেখিয়ে দিন।'

তিনি তখন অনিচ্ছাভরে গাঁয়ের সীমানা পর্য্যন্ত এসে আমায় জলা দেখিয়ে দিলেন। জলাটা সেখান থেকে মাইল খানেক দূরে

—চাঁদের আলো তার ওপর ঝক্ ঝক্ করছে আর ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট পাখীর সারি তার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

চাঁদ্‌নী রাতে জলার ধারে কি করে পাখী শিকার করতে হয় তা বোধহয় সকলে জানেনা ; অথচ ব্যাপারটা খুব সহজ—এমন কি দিনের বেলা পাখী শিকার করার চেয়েও সহজ। রাত্রে জলার পাখীরা চোখে ভাল দেখতে পায়না কিন্তু কেবলেই উড়ে বেড়ায়—জলার এধার থেকে ওধারে যায় আবার এধারে ফিরে আসে। তাই, চাঁদ যখন গাছের ডগা ছাড়িয়ে ওঠে তখন সেই চাঁদের দিকে লক্ষ্য রেখে বন্দুকে টোটা ভরে কোনো ঝোপের আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। পাখীর সার যখন চাঁদের ওপর দিয়ে উড়ে যায় তখন চাঁদ লক্ষ্য করে বন্দুক ছুঁড়তে হয়। ছররা খেয়ে পাখীগুলো ধপ্ ধপ্ করে মাটিতে পড়ে। তখন কুকুর গিয়ে সেগুলোকে খুঁজে নিয়ে আসে। এ রকম শিকারের সুবিধা এই যে পাখীর পিছন পিছন ঘুরে বেড়াতে হয়না, এক জায়গায় দাঁড়িয়েই অনেক পাখী পাওয়া যায়।

যাহোক, আমি আর পিণ্টু আলের ওপর দিয়ে জলার দিকে চললুম। বেশ একটু ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। কিন্তু আমার গায়ে গরম কোট হাফ্ প্যাণ্ট্ ছিল, পায়ে গরম হোস্ আর বুটজুতো ছিল, তাই ঠাণ্ডা হাওয়া ভালই লাগল। পকেটে গোটা কুড়ি চার নম্বরের কার্তুজ নিয়েছিলুম—আশা ছিল তাইতেই আজকের মতন কাজ চলে যাবে।

ক্রমে জলার কাছে এসে পড়লুম। এখানকার মাটি নরম, মাঝে মাঝে জল সরে গিয়ে আধ শুকনো পাঁকও রয়েছে। জলাটা প্রকাণ্ড—একটা হ্রদ বললেও চলে; কিন্তু জল খুব গভীর নয়। তার কিনারা ঘিরে ঘন শরবন জন্মেছে, মাঝখানেও স্থানে স্থানে শরের গোছা উঁচু হয়ে আছে। চাঁদের আলোয় সমস্ত দৃশ্যটা এমন অস্পষ্ট হয়ে আছে—যেন পৃথিবীর আদিম যুগের তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রকৃতির চিত্র। দেখলে প্রাণের ভিতরটা কেমন করে ওঠে।

জলের কিনারা পর্য্যন্ত যাবার কোনো দরকার ছিলনা, চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম কতকগুলো কাঁটাগাছের শুক্‌নো ঝোপ ইতস্ততঃ ছড়ানো রয়েছে। তারই মধ্যে একটা বেছে নিয়ে আমি তার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালুম। বন্দুকে টোটা ভরে পাখীর জন্যে তৈরী হয়ে রইলুম।

এইবার পিণ্টুর চাল চলন লক্ষ্য করলুম। সে এতক্ষণ বেশ লাফালাফি করতে করতে আমার সঙ্গে আসছিল কিন্তু এখানে এসেই কেমন যেন জড় সড় হয়ে গেল। তার ল্যাজটি করুণভাবে পায়ের মধ্যে প্রবেশ করল, সে শঙ্কিত চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে একটা ক্ষীণ কুঁই কুঁই শব্দ করতে লাগল।

চারিদিকে চেয়ে দেখলুম, অন্য কোনো কুকুর বা ভয়াবহ কিছুই নেই। ভাবলুম, জলার ধারে ঠাণ্ডা হাওয়ায় নিশ্চয় তার শীত করছে, তাই অমন করছে।

খানিকক্ষণ চুপ চাপ দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ একটা শব্দ শুনে চম্‌কে উঠলুম। জলার কিনারা দিয়ে একটা খট্‌-খট্‌ খট্‌-খট্‌ শব্দ ক্রমশ আমার দিকে এগিয়ে আস্‌ছে—যেন একটা বিকট হাসির আওয়াজ! কিন্তু তখনি বুঝতে পারলুম যে অস্বাভাবিক কিছু নয়, শরবনের মধ্যে দিয়ে হাওয়া বইছে। এই খট্‌-খট্‌ শব্দ ক্রমে আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল, দূরে গিয়ে মিলিয়ে গেল,—কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাসের মত একটা শব্দ তখনো শরবনের ভিতর থেকে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তে লাগল। আমার ভারি হাসি পেল,—এইসব শব্দ শুনেই বোধহয় গাঁয়ের লোকেরা ভূত পেত্নীর ভয়ে এদিকে আসেনা।

আবার শব্দ! এবারের শব্দ এমনি অপার্থিব যে শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। বহুদূর জলার বুক থেকে একটা দীর্ঘ কান্নার সুরু, যেন কোনো স্ত্রীলোক কেঁদে উঠ্‌ল—'আহা—হা—হা—হা—'চারিদিকে প্রতিধ্বনি তুলে এই কান্না ক্রমে ক্ষীণ হয়ে গেল।

জলাতে অনেক রকম অজানা পাখী থাকে, মনে হল হয়ত তাদেরই কেউ অমন করে কেঁদে উঠ্‌ল। কিন্তু আমি অনেক পাখী মেরেছি, অনেক ঝিলে জঙ্গলে বেড়িয়েছি, এরকম পাখীর ডাক কখনো শুনিনি। একবার মনে হল,—পাখী বটে ত? পিণ্টুর দিকে তাকিয়ে দেখি, সে আমার পা ঘেঁষে এসে বসেছে আর তার শরীর থরথর করে কাঁপ্‌ছে। আমি তার পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে বললুম,—'কিছু ভয় নেই পিণ্টু,—ও পাখীর ডাক।'

পিণ্টু করুণভাবে আমার দিকে তাকাল, তারপর ছুটে গাঁয়ের দিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসে ব্যগ্রচোখে আমার পানে চেয়ে রইল। কুকুর কথা কইতে পারেনা, কিন্তু পিণ্টু যেন পরিস্কার আমাকে বললে,—'ফিরে চল, এ বড় খারাপ জায়গা, এখানে থেকে কাজ নেই।'

হায়! পিণ্টুর কথা যদি শুনতুম!

হাতের ঘড়িতে দেখলুম, সাড়ে নটা বেজেছে! এই সময় আকাশে শন্-শন্ শব্দ শুনে মুখ তুলে দেখি একঝাঁক পাখী—বোধহয় মোর-গাবি, কারণ মোরগাবিরা এত জোরে ওড়ে যে তাদের ডানার সাঁই সাঁই আওয়াজ হয়—চাঁদের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্চে। তৎক্ষণাৎ বন্দুক তুলে ফায়ার করলুম—চারি দিকে একটা বিকট প্রতিধ্বনি উঠ্‌ল। তারপরে ধপ্ করে একটা শব্দ হল। বুঝলুম পাখী পড়েছে।

পাখী পড়ার শব্দে পিণ্টুর ভয় কেটে গেল। সে কান খাড়া করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর লাফাতে লাফাতে যেদিকে পাখী পড়েছিল সেইদিকে ছুট্‌ল।

পাখীটা পঞ্চাশহাত দূরে একটা ঝোপের মধ্যে পড়েছিল, পিণ্টু সেই ঝোপের কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল তারপর চোঁ চোঁ করে পালিয়ে এসে আমার জুতোর মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে পড়ল। আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললাম,—'কি হয়েছে পিণ্টু? পালিয়ে এলি যে?' তার গায়ে হাত দিয়ে দেখি তার ঘাড়ের রোঁয়া কাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠেছে।

পিণ্টু কখনো এ রকম করে না, তাই ভারি আশ্চর্য্য হয়ে আমি নিজেই সেই ঝোপটার দিকে অগ্রসর হলুম। কাঁটাগাছের ঝোপে পাতা নেই, তার ভিতরে পরিষ্কার চাঁদের আলো পড়েছে। ঝোপের দশ হাতের মধ্যে গিয়ে আমিও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। দেখলুম, মরা পাখিটা মাটিতে পড়ে রয়েছে, আর, শাদা কাপড় পরা একটা স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি তার ওপর ঝুঁকে পড়ে যেন তাকে আগলে রয়েছে।

এই সময় আবার সেই তীব্র কাতরোক্তি ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল,—আহা—হা—হা —হা—'

ভয়ের একটা শিহরণ আমার হাত পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। কে ও? মানুষ না আর কিছু? অমন করে কেঁদে উঠ্‌ল কেন?

প্রাণ পণে ভয় দমন করে আমি জিজ্ঞাসা করলুম,—'কে?'

আবার সেই বুক-ফাটা কান্না,—'আহা—হা—হা—হা—'

আমি জড়মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইলুম; ইচ্ছে হল পালাই, কিন্তু পালাতে পারলুম না। আমার দুই চোখ সেই ঝোপের মধ্যে নারীমূর্ত্তির ওপর নিবদ্ধ হয়ে রইল।

হঠাৎ নারীমূর্ত্তি উঠে দাঁড়াল, ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। আমি তার মুখ দেখতে পেলুম না, সর্ব্বাঙ্গ কুয়াশার মত শাদাকাপড় দিয়ে ঢাকা। সে একটা শাদা হাত তুলে আমায় ডাকলে, তারপর নিঃশব্দে চলে যেতে লাগল।

খানিক দূর গিয়ে সে ফিরে দাঁড়াল, তারপর আবার হাত

তুলে আমায় ডাকলে। আমার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি যেন একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, কলের পুতুলের মত আমি তার পিছন পিছন চললুম।

পিণ্টু এতক্ষণ অনেকদূরে পেছিয়ে ছিল, এবার সে ছুটে এসে আমার পা কামড়ে ধরলে। ভয়ে তার গা কাঁপছে, শরীর যেন কুঁকড়ে ছোটহয়ে গেছে, তবু সে আমায় ফেলে পালাতে পারছে না। আমার পা কামড়ে ধরে পিছন দিকে টানতে লাগল, যেন কিছুতেই আমাকে যেতে দেবে না।

কিন্তু চুম্বকের আকর্ষণ লোহাকে যেমন টেনে নিয়ে যায় আমিও তেমনি অন্ধভাবে সেই মূর্ত্তির অনুসরণ করলুম। পিণ্টু পদে পদে বাধা দিতে লাগল, পায়ের কাছে পড়ে কেঁউ কেঁউ করে মিনতি জানাতে লাগল, কিন্তু আমার গতিরোধ করতে পারল না।

ক্রমে তল্‌তলে নরম পাঁকের ওপর এসে পড়লুম। সে যে কি ভয়ঙ্কর জিনিষ তা বর্ণনা করা যায় না। আর এই পাঁকে আস্তে আস্তে ডুবে মরার মত ভয়াবহ মৃত্যুও কল্পনা করা কঠিন। আমি কিন্তু কোথায় যাচ্ছি কিছুই জ্ঞান ছিলনা, কেবল সেই মূর্ত্তির দিকে চোখ রেখে এগিয়ে যাচ্ছিলুম। কিন্তু ক্রমে যখন পাঁকের মধ্যে হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবে যেতে লাগল তখন দাঁড়িয়ে পড়লুম। মূর্ত্তিও সামনে খানিক দূরে দাঁড়াল। তারপর আবার সেই রক্ত-জল করা আওয়াজ,—'আহা—হা—হা—হা—'। এবার কিন্তু কান্না নয়, মনে হল যেন সে একটা পৈশাচিক প্রতিহিংসার হাসি হাসছে।

)

আমি আর এগিয়ে যাচ্চিনা দেখে মূর্ত্তি দু'এক পা ফিরে এল, খানিক দাঁড়িয়ে থেকে আবার আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাক্‌লে। ওদিকে আর বেশী এগোলে এই অতল পাঁকের মধ্যেই ডুবে যাব বেশ বুঝতে পারছি, কিন্তু তবু ঐ হাতছানি অমান্য করবার সাধ্য নেই। বন্দুকটা এতক্ষণ হাতেই ছিল, এবার ফেলে দিলুম। তারপর পাগলের মত সেই পাঁকের ভিতর দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চললুম।

পিণ্টু! এই সময় পিণ্ট যে অদ্ভুত কাজ করলে তা জীবনে কখনো ভুলবনা। সে এতক্ষণ আমার পিছন্ পিছন্ আস্‌ছিল, কিন্তু যখন দেখলে যে আমি উরু পর্য্যন্ত কাদায় ডুবে যাচ্চি তখন সে হঠাৎ একটা বিকট চীৎকার করে আমার সামনে এল। আমি দেখলুম, তার সর্ব্বাঙ্গের রোঁয়া খাড়া হয়ে উঠেছে আর সে হিংস্র ভাবে দাঁত বার করে সেই মূর্ত্তির পানে ছুটে চলেছে।

শাদা মূর্ত্তিটার সামনে পৌঁছে সে তার কণ্ঠ লক্ষ্য করে তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল; সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত্ত কম্পিত চীৎকার পিণ্টুর কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এল। যাকে লক্ষ্য করে সে লাফ দিয়েছিল সেই মূর্ত্তি হঠাৎ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল; পিণ্টু কোথাও বাধা না পেয়ে কাদায় পড়ে গেল। আর উঠ্‌লনা।

পিণ্টু! পিণ্টু!'—আমি আত্মহারার মত ছুটে গেলুম যেখানে পিণ্টু পড়ে ছিল। সেখানে পাঁক তত গভীর নয়, তলায় শক্ত মাটি আছে। পিণ্টুর নিশ্চল দেহ দু'হাতে তুলে নিয়ে

দেখলুম তার দেহে প্রাণ নেই—সে মরে গিয়েছে। সেই যে ভয়ার্ত্ত চীৎকার,—তারই সঙ্গে সঙ্গে পিণ্টুর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গিয়েছে।

চারিদিকে চেয়ে দেখলুম, সেই সাদা মূর্ত্তি কোথাও নেই—যেন জলাভূমি থেকে উত্থিত একটা দুষ্ট বাষ্প আবার জলাভূমিতেই মিলিয়ে গিয়েছে।

'পিণ্টু! পিণ্টু!' বলে তার কাদা-মাখা শরীর বুকে জড়িয়ে নিয়ে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লুম।

পরদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে জ্ঞান হল। তখনো পিণ্টুর মৃতদেহ বুকে জড়িয়ে আছি।

সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা আর ১০৫ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে একলা বাড়ী ফিরে এলুম।

ক্রমে সেরে উঠলাম। এখনও মাঝে মাঝে শিকারে যাই, কিন্তু আমার পিণ্টু নেই, শিকারে মন লাগে না।

যখন মনে হয় পিণ্টু আমার প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে নিজের প্রাণ দিয়েছে,—দারুণ ভয়ে তার বুকের স্পন্দন থেমে গেছে কিন্তু তবু ভালবাসা একতিল কমেনি—তখন কান্নায় বুক ভরে উঠে।

পিণ্টু সাহসী কুকুর ছিল না; কিন্তু দরকারের সময় তার মতন সাহস ক'জন দেখাতে পেরেছে?

মোক্তার-ভূত

শিবু-মোক্তার আর বেনী-মোক্তারকে মহকুমার সকলেই চিন্‌ত,—তাদের মতন ধূর্ত্ত ধড়িবাজ লোক ও-তল্লাটে আর ছিল না। লোকে যেমন তাদের চিন্‌ত তেমনি ভয়ও করত। একবার তাদের পাল্লায় পড়লে আর কারুর রক্ষে ছিল না,—জোঁক যেমন গা থেকে রক্ত শুষে নেয় অথচ জানতে পারা যায় না, তারাও তেমনি মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে টাকা শুষে শুষে মক্কেলকে সর্ব্বস্বান্ত করে দিত।

আদালতে দু'জনের মধ্যে রেশারেশি চলত, আবার বাইরে ভাবও ছিল। শিবু মক্কেলকে বলত,—'বেনীটা জানে কি? ওকে এক তুড়িতে উড়িয়ে দেব।' আবার বেনীও নিজের মক্কেলকে বল্‌ত,—'শিবুটা একটা আস্ত গাধা,—আইনের প্যাঁচে ফেলে ওর দফা-রফা করব।'—কিন্তু সন্ধ্যেবেলা একজন আর একজনের দাওয়ায় বসে তামাক না খেলে রাত্রে ঘুম হত না।

এমনিভাবে দুই মোক্তার সারাজীবন পরস্পরের সঙ্গে বাইরে বন্ধুত্ব আর ভিতরে শত্রুতা করে ক্রমে বুড়ো হয়ে এল। দু'জনেরই বেশ টাকা কড়ি বাড়ী ঘর হয়েছে—বলতে গেলে তারাই দেশের মধ্যে সবচেয়ে গণ্যমান্য হয়ে উঠেছে। বারোয়ারী দুর্গাপূজায় এক বছর শিবু প্রেসিডেণ্ট হয়, পরের বছর বেনী প্রেসিডেণ্ট হয়—স্কুল-কমিটিতেও তাই। কেউ কারুর চেয়ে খাটো নয়।

ওদের ছু'জনের মধ্যে বোধ হয় শিবুরই ফিচ্‌লে বুদ্ধি বেশী ছিল। সে একদিন মনে মনে মৎলব আঁট্‌লে—বেনীকে ভাল করে ঠকাতে হবে। কারণ এ পর্য্যন্ত কেউ কাউকে ভাল করে ঠকাতে পারেনি, বুদ্ধির যুদ্ধে কখনো বেনী জিতেছে কখনো শিবু জিতেছে। ফলে দুজনের মধ্যে কেউই বড়াই করে বলতে পারত না যে, আমি বেশী চালাক।

শিবু মোক্তার ফন্দি ঠিক করে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা হন্তদন্ত হয়ে বেনীকে গিয়ে বললে,—'ভাই বেনী, বড় বিপদে পড়েছি। পঞ্চাশটা টাকা ধার দিতে পার, কালই ফেরৎ পাবে।'

বেনী শিবুর মৎলব বুঝতে পারলে না, বললে,—'তার আর কি। নিয়ে যাও।'

শিবু টাকা নিয়ে নিজের বাড়ীতে গিয়ে গ্যাঁট্‌ হয়ে বসল পরদিন টাকা ফেরৎ দেবার কথা, কিন্তু শিবুর দেখা নেই। বেনীর মন উতলা হয়ে উঠ্‌ল। তারপর আরো ছু'দিন কেটে গেল, কিন্তু শিবুর টাকা দেবার কোন চেষ্টাই দেখা গেল না।

বেনী মহা ফাঁপরে পড়ল। সে বুঝলে শিবু তাকে বিষম ঠকিয়েছে—কিন্তু লজ্জায় সেকথা কারুর কাছে বল্‌তে পারলে না। হ্যাণ্ড্‌নোট্‌ না লিখিয়ে নিয়ে শিবুকে সে টাকা ধার দিয়েছে একথা জানাজানি হলে দেশশুদ্ধ লোক হাসবে; বলবে,—'বেনী মোক্তারটা গাধা!' শিবুও তাই চায়। বেনী মোক্তার ভেবে ভেবে আধখানা হয়ে গেল।

শিবুর সঙ্গে যখনি দেখা হয় বেণী ফিস্‌ফিস্ করে বলে,—'ভাই শিবু, আমার টাকা ?'

শিবু বলে,—'কিসের টাকা ?'

বেনী বলে,—'সেই যে সেদিন তুমি ধার নিলে—পঞ্চাশ টাকা !'

শিবু হেসে বলে,—'বেনী ভাই, বুড়ো হয়ে তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? পঞ্চাশ টাকা আবার আমি কবে নিলুম ?'

বেণী রেগে বলে,—'দেবে না তাহলে ? আচ্ছা আমিও দেখে নেব ?'

শিবু হ্যা-হ্যা করে হেসে বলে,—'বেশ ত, মকদ্দমা করনা—হ্যাণ্ড্‌নোট্ আছে নিশ্চয় ?'

বেণী রাগে দাঁত কড়মড় করতে করতে চলে যায়।

ক্রমে কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে বেণীর পঞ্চাশ টাকা শিবু মোক্তার বেবাক ঠকিয়ে নিয়েছে। সবাই আহ্লাদে আটখানা, ভাবলে,—'আহা, কাগের মাংসও কাগে খায় ?' বেণীকে সকলে জিজ্ঞাসা করতে লাগল,—হ্যাঁ দাদা, তুমি নাকি লেখাপড়া না করেই শিবুকে টাকা ধার দিয়েছিলে ? শেষে তোমার এই দুর্ব্বুদ্ধি হল ?'

বেণী কিন্তু কিছুতেই মানতে চায় না, ঘাড় নেড়ে বলে,—আরে না না, ওসব শিবেটার মিথ্যা কথা। শুধু হাতে টাকা ধার দেব আমি ? আমাকে কি কুকুরে কামড়েছে ? দাঁড়াও না, শিবেকে আমি—'

যখন একলা থাকে তখন শিবুর পেজোমির কথা ভেবে দাঁত কড়মড় করে আর গালাগাল দেয়।

এমনি ভাবে টাকার কথা ভেবে ভেবে বেণী অসুখে পড়ল। একে বুড়ো বয়স তার ওপর টাকার শোক—বেণী যায় যায়। ডাক্তার বদ্যিরা তার অবস্থা দেখে আশা ছেড়ে দিলে।

বেণী কিন্তু তখনো টাকার আশা ছাড়েনি ; কেবলই ভাবছে, কি করে শিবুর কাছ থেকে টাকা উদ্ধার করবে ! তার আর অন্য চিন্তা নেই। যখন বদ্যি নাড়ী দেখে বললে,—'হরি নাম কর ! গঙ্গা নারায়ন ব্রহ্ম ! গঙ্গাজল মুখে দাও।' বেণী তখনো ভাবছে কোন্ ফিকিরে শিবুর কাছ থেকে টাকা আদায় করবে।

শেষে মরণের আর দেরি নেই দেখে বেণী শিবুকে ডেকে পাঠালে। শিবু এসে তার পাশে বসতেই বেণী আর সকলকে সরে যেতে বললে। সবাই সরে গেলে বেণী কট্‌মট্‌ করে শিবুর দিকে চেয়ে বললে, 'আমার টাকা ?'

শিবু মনে-মনে হেসে বললে,—'কিছু ভেবোনা ভাই বেণী ; তোমার টাকা ঠিক আছে। এখন হরি-নাম কর। তোমার ভাল-মন্দ একটা কিছু হলেই তোমার টাকা তোমার ছেলেকে দেব—তুমি নিশ্চিন্দি হয়ে বৈকুণ্ঠে যাও।'

বেণী বললে,—'না, এখুনি দাও।'

শিবু বললে,—'এখন টাকা কোথায় পাব ভাই ? কালই তোমার ছেলের হাতে দিয়ে দেব—তুমি ভেবোনা।'

বেণীর প্রাণ তখন কণ্ঠায় এসেছে পৌঁচেছে ; তবু সে গোঁ ধরে বললে,—'না—এখুনি টাকা দাও।'

শিবু দেখলে মিনিট দশেকের মধ্যেই বেণী পটল তুলবে, সে বললে,—'আচ্ছা, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি টাকা আনছি।' বলে সে চলে গেল।

নিজের বাড়ীতে ফিরে গিয়ে শিবু গম্ভীর ভাবে বসে রইল। তারপর বেণীর বাড়ী থেকে যখন মড়াকান্না উঠেছে তখন সে আবার বেণীর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হল। যেন কতই শোক পেয়েছে এম্‌নি ভাবে কাঁদতে কাঁদতে বেণীর ছেলেকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। বললে,—'আমি আর বেণী—একমন একপ্রাণ ছিলুম ; তাই শেষ সময়ে আমাকে দেখ্‌বে বলে বেণী ডেকে পাঠিয়েছিল। যাবার সময় বলে গেল,—আমার ছেলে নেহাৎ ছেলেমানুষ—দেখবার শোন্‌বার কেউ নেই—তুমিই দেখাশুনো করো।—তা তুমি কিছু ভেবোনা বাবা, তোমাদের সব ভার আজ থেকে আমি নিলুম। বেণী আমার কাছ থেকে অনেক টাকা ধার নিয়ে ছিল, তা সে যাক গে, সে টাকা আমি তোমাকে দিলুম। হ্যাণ্ড্‌নোট্‌গুলো আমি সব ছিঁড়ে ফেলে দেব।'

পাড়া-পড়্‌শী যারা ছিল তারা শুনে অবাক হয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌ল 'তাইত ! কি আশ্চর্য্য ! শিবুর সঙ্গে বেণীর এত ভালবাসা ছিল ?'

ক্রমে বিকেল হয়ে আসছিল ; পাড়ার অনেক ছেলে ছোকরা

জুটে বেণীর মড়া কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে চলল। শিবুও বন্ধুত্বের খাতিরে সঙ্গে গেল। ইচ্ছেটা, বেণীর শেষ দেখে তবে বাড়ী ফিরবে।

গঙ্গার ধারে শ্মশানঘাটে যখন সবাই পৌঁছুল তখন সন্ধ্যা হয়-হয়; পশ্চিমের আকাশে আলো, ঝিল্‌মিল্‌ করছে। মড়া নামিয়ে ছেলে ছোক্‌রারা কাঠের সন্ধানে বেরুল। শিবু বুড়ো মানুষ, তাই সে মড়া ছুঁয়ে ঘাটেই বসে রইল।

কেউ কোথাও নেই, শিবু একলাটি মড়ার চালি ধরে বসে আছে আর ভাব্‌ছে—বেণীকে কি ঠকানোই ঠকিয়েছি টাকাকে টাকা পেলুম, আবার বেণীটা মরেও গেল। এখন আমি একলাই মোক্তারি করব—আর আমায় পায় কে?

মনের আনন্দে শিবু একটা বিড়ী ধরিয়েছে এমন সময় হঠাৎ পিছন থেকে প্রচণ্ড এক চড় খেয়ে শিবু প্রায় চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল! ধড়মড় করে উঠে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে কেউ কোথাও নেই! বেণীর মড়া চালির ওপর শুয়ে আছে।

কে চড় মারলে?

শিবু জীবনে অনেক মড়া পুড়িয়েছিল, তাই শ্মশানে তার ভয় ছিলনা। সে ভাবলে—এ, কি হল? তবে কি কোনো শকুনি কিম্বা গীধ তার গালে পাখার ঝপ্‌টা মেরে গেল? কিন্তু তাই বা কি করে হবে? আকাশেত একটাও পাখী নেই! শিবুর বড়ই ভাবনা হল। সে সতর্ক ভাবে বসে মড়া পাহারা দিতে লাগল।

শিবু মড়ার পায়ের দিকটাতে বসেছিল, হঠাৎ মড়াটা এক পা তুলে ক্যাঁৎ করে তার পেটে এক লাথি কশিয়ে দিয়ে আবার যেমন ছিল তেম্নি ভাবে শুয়ে রইল। লাথি খেয়ে শিবু 'কোঁক্', করে উঠেছিল, কিন্তু তবু সে সহজে ভয় পাবার পাত্র নয়। তার মনে হল, বেণীটা নিশ্চয় মরেনি, তাকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করবার এই ফন্দি বার করেছে। নইলে মড়া কখনো লাথি মারতে পারে?

শিবু বেণীর নাড়ী টিপে দেখলে,—নাড়ী নেই!—গা বরফের মতন ঠাণ্ডা! তখন বুকে কান রেখে দেখলে শব্দ হচ্চে কি না। কিন্তু বুকও একেবারে নিস্তব্ধ।

এই দেখে শিবুর ভীষণ ভয় হল,—বেণী যে মরে গিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, সুতরাং এ বেণীর ভূত না হয়ে যায় না। বেণী যে ভূত হয়েও সেই পঞ্চাশ টাকার কথা ভোলেনি তা বুঝতে পেরে শিবু উঠে পালাতে গেল। কিন্তু পালাবার যো কি! যেই সে মড়ার বুক থেকে মাথা তুলতে যাবে অমনি বেণীর মড়া তড়াক করে চালির ওপর উঠে বসে দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরলে। শিবু গলা ছাড়াবার জন্যে যতই টানাটানি করে বেণীর মড়া ততই তাকে জোরে আঁক্ড়ে ধরে। শেষে সেই শ্মশানের ওপর মড়ায় মানুষের দস্তুরমত কুস্তি বেধে গেল। এ ওঠে ত ও পড়ে, ত এ ওঠে। শিবু যেই পালাতে যায় অমনি বেণীর মড়া তাকে লেঙ্গি দিয়ে ফেলে দেয়। শিবু 'বাবারে' 'মারে' 'গেলুম রে' করে চেঁচাতে লাগল আর মড়ার সঙ্গে লড়াই করতে লাগ্‌ল।

কিন্তু ভূতের সঙ্গে শিবু পারবে কেন ? বেণীর মড়া একেবারে নাছোড়বান্দা—কিছুক্ষণ পরেই শিবু ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে ছেলে ছোকরারা কাঠ জোগাড় করে ফিরছিল, তারা শিবুর চীৎকার শুনে দৌড়ে এসে যে-দৃশ্য দেখলে তাতে তাহাদের বুকের রক্ত প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

তারা দেখলে, বেণীর মড়া আর শিবু চালির ওপর পাশাপাশি গলা-জড়াজড়ি করে বসে আছে। মড়ার মুখে বিন্দুমাত্র বিকৃতি নেই, কিন্তু তার একটা হাত সাঁড়াশির মতন শিবুর গলাটি জড়িয়ে আছে। শিবুর মুখ ভয়ে নীল হয়ে গেছে, সে মাঝেমাঝে উঠে পালাবার চেষ্টা করেছে কিন্তু পালাতে পারছে না—আবার বসে পড়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

শিবুর ছেলেও মড়া পোড়াতে এসেছিল, তাকে দেখে শিবু ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল,—'ওরে বাবা, শিগ্‌গির বাড়ী যা। পঞ্চাশটা টাকা বেণীর বৌয়ের হাতে দিয়ে আসগে যা, নইলে আমাকে ছাড়বে না।'

শিবুর ছেলে বাপের অবস্থা দেখে বাড়ী দৌড়ল। আর সকলে আলো জ্বেলে চালি ঘিরে বসে রইল। পোড়াবার উপায় নেই, পোড়াতে হলে দুই মোক্তারকে একসঙ্গে পোড়াতে হয়। কারণ, বেণীর মড়া তখনো শিবুর গলা জাপ্‌টে ধরে বসে আছে।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। তারপর হঠাৎ মড়াটা শিবুর গলা ছেড়ে দিয়ে আবার চালির ওপর চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পড়ল।

সবাই একসঙ্গে চমকে উঠল, তারপর বুঝতে পারলে যে ওদিকে বেণীর পঞ্চাশ টাকা আদায় হয়ে গেছে।

বন্ধুর বাহু বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে শিবু আর সেখানে দাঁড়াল না, একবার 'বাবাগো' বলেই সেই অন্ধকারে পোঁ পোঁ করে শ্মশান ছেড়ে পালাল।

পুষি ও ভুলোর অরণ্য বাস

গ্রামের ঠিক কিনারা থেকেই বল্‌তে গেলে বন আরম্ভ হয়েছে। প্রথমটা ফাঁকা-ফাঁকা, এখানে একটা গাছ ওখানে একটা গাছ, তারপর ক্রমে নিবিড় জঙ্গল। বড় বড় ঝাঁক্‌ড়া-মাথা গাছ স্তম্ভের মতন আকাশের পানে উঠে গেছে, তাদের পাতায় পাতায় জড়াজড়ি মেশামিশি, ডালে ডালে পাক খেয়ে গেছে—কুস্তিগিরি পালওয়ানদের হাত পা যেমন পরস্পরের গায়ে জড়িয়ে যায়। নীচে ঘন ঘাস, লতা, কাঁটার ঝোপ, আর অন্ধকার। কত জন্তু এই গহন বনের মধ্যে আছে তার ঠিকানা নেই। হাতী আছে বাঘ আছে, ভাল্লুক আছে, অজগর তার বিরাট অ-নড় শরীর নিয়ে শুয়ে আছে। দিনের বেলা কেউ তাদের দেখতে পায় না রাত্রে গাঁয়ের লোকেরা শুনতে পায়,—হঠাৎ নেকড়ের ক্ষুধিত চীৎকার, হরিণের ভয়ার্ত্ত কান্না, ক্বচিৎ, হাতীর শৃঙ্গ-নিনাদ, খট্টাসের খট্‌খট্‌ হাসি। আর দেখতে পায়,—অন্ধকার বনের কিনারে জোনাকির মত নীল চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু গাঁয়ের মধ্যে কোনো জন্তুর প্রবেশ-অধিকার নেই। তারা জানে, গ্রামে একটা ভয়ঙ্কর জিনিষ আছে—আগুন। তাই তারা দূর থেকে নিষ্ফল গর্জ্জন করে সরে যায়, আগুণের কাছে

আসতে পারে না। কিন্তু গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে কোনো মানুষ যদি রাত্রে বনের মধ্যে পদার্পণ করে তার আর পরিত্রাণ নেই, বনের সতর্ক প্রহরীরা তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রাস করবে।

এই ভাবে দুই পক্ষই চিরিদিন এই সীমানার মর্য্যাদা রক্ষা করে এসেছে।

গ্রাম আর বনের ঠিক মাঝপথে একটা প্রকাণ্ড গাছ একলা দাঁড়িয়ে আছে; যেন সে এই সীমান্তের প্রহরী। তারই ছায়ায় একদিন দুপুর বেলা পুষি আর ভুলো বসে ছিল। পুষি আর ভুলো গ্রামেরই বাসিন্দা,—পুষির গায়ের লোম শাদা ল্যাজটি কালো; আর ভুলো আগাগোড়া শাদা। বছর দুই আগে পুষি যখন শিশু অবস্থায় এই গ্রামে আসে তখন ভুলো তার ওপর ভারি বিরক্ত হয়েছিল—কিন্তু ক্রমে তাদের মধ্যে শত্রুতার ভাব কেটে গিয়েছে। এখন দুজনের মধ্যে ভারি বন্ধুত্ব।'

পুষি কিছুক্ষণ করুণভাবে বনের দিকে তাকিয়ে থেকে মাটির ওপর কাৎ হয়ে শুলো. তারপর পিছনের বাঁ পা দিয়ে কাণ-চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে বললে,—'গাঁয়ে আর থাকতে ইচ্ছে করেনা। ঘেন্না ধরে গেছে।'

ভুলো পিঠের লোমের মধ্যে একটা কুকুরে মাছির অনুসন্ধান করছিল, বললে,—'আবার কি হল?'

পুষি কাণ চুল্‌কোনো শেষ করে একটু গম্ভীর হয়ে বসে বল্‌লে,—'হবে আবার কি, তাই বল্‌ছি। আমরা বনের প্রাণী বনই

আমাদের ঘরবাড়ী, গাঁয়ে থাকা আমাদের পক্ষে বনবাস। ভুলো কুকুরে মাছিটাকে ধরতে পারলে না পুষির দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলে, 'আজ আবার মার খেয়েছিস—না? খুলেই বলনা বাপু, অত লজ্জা কিসের?'

পুষি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—'দ্যাখ ভুলো মানুষকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই। ওদের মতন নেমকহারাম জাত আর পৃথিবীতে নেই। নইলে ওদের জন্যে আমি কি না করেছি? একবার ভেবে দ্যাখ দেখি।'

ভুলো আকাশের দিকে মুখ করে অনেকক্ষণ ভাবলে কিন্তু পুষি মানুষ জাতির কি মহৎ উপকার করেছে তা ভেবে পেলেনা, শেষে বললে—'আজ কি হয়েছিল শুনি?'

পুষি শিরদাঁড়ার ওপর একটা জায়গা সাবধানে চাট্‌তে চাট্‌তে বললে,—'অন্যমনস্কভাবে দুধের কড়ায় মুখ দিয়ে ফেলেছিলুম এই অপরাধ। অম্‌নি বাড়ীর বৌটা ছুটে এসে পিঠে এক ঘা চেলা কাঠ বসিয়ে দিলে। আর, যে-সব গালমন্দ দিলে সে আর তোর শুনে কাজ নেই'।

ভুলো গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললে,—'তোর ঐ দোষ কিছুতেই গেলনা পুষি। কত বোঝালুম কিছুতেই বুঝলিনা। আচ্ছা রান্নাঘরে ঢুকতে যাস কেন? আমার মতন ভদ্রভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারিস না?'

পুষি একটু গরম হয়ে বললে,—আমি কি তোর মত ছোটলোক

যে বাইরে দাড়িয়ে থাকব ? আমার সর্ব্বত্র গতি, জানিস আমি কত বড় বংশের মেয়ে ?

ভুলো চাপা বিদ্রুপের সুরে বললে—'না তুইই বল্‌না শুনি'। পুষি বনের পানে একবার তাকিয়ে খুব আমীরী চালে বললে—'ঐ বনের রাজা কে—জানিস ?' ভুলো মিটি মিটি তাকিয়ে বললে,—'জানি—হাতী।' পুষি বললে 'ছাই জানিস, তুই একটা গাধা।'

তবে কে—ভাল্লুক ?

'ভাল্লুক' পুষি নাক সিঁটকে বললে—'ভাল্লুক ত তার গোমস্তা। বাঘ ! বাঘ ! নাম শুনেছিস কখনো ?'

'শুনেছি তা বাঘের সঙ্গে তোর কি সম্বন্ধ ?'

পুষি ভয়ঙ্কর গম্ভীর হয়ে বললে—'আমি আর বাঘ একই বংশ। আমরা সবাই দীর্ঘদন্ত ঠাকুরের সন্তান—বুঝলি ? বাঘ সম্পর্কে আমার বোনপো হয়—চেহারার আদল্ দেখিসনি ?'

ভুলো হ্যা হ্যা করে হেসে বললে—'পুষি, তুই থাম্—আর জ্বালাস্ নি, দীর্ঘদন্ত ঠাকুরের সন্তান তোর বোনপো যদি তোকে একবার পায় তাহলে এম্‌নি করে মাথায় একটি থাবা মেরে তোর দফা নিকেশ করে দেয়।' বলে ঠাট্টাচ্ছলে পুষির মাথার ওপর নিজের ডান পায়ের থাবাটা রাখ্‌লে।

পুষি অমনি ফ্যাঁস্ করে উঠে বললে—'খবরদার ভুলো ! মাথায় পা দিয়েছিস কি আঁচড়ে নাক মুখ ছিঁড়ে দেব।'

ভুলো তাচ্ছিল্যভরে বললে—'তুই আর বড়াই করিসনি একবার

যদি টুঁটি ধরে নাড়া দিই তাহলে আর উঠে দুধের পথ্যি করতে হবে না।'

দুজনে কিছুক্ষণ দুদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল। ভুলো সামনের পায়ের ওপর মাথা রেখে মিটি মিটি চাইতে চাইতে একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল এমন সময় দূর থেকে 'ভুলো' 'ভুলো' ডাক শুনে চমকে উঠল। এ তার মনিবের ডাক। ভুলো ঘেউ ঘেউ করে সাড়া দিয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

অনেকক্ষণ ভুলোর দেখা নেই। পুষি একলা বসে বসে মানুষের হৃদয়হীনতার কথা ভাবতে লাগল। একটু কৃতজ্ঞতা কি তাদের নেই? কত ইঁদুর সে ধরেছে তা কি তারা জানেনা? গোলা একেবারে নি-ইঁদুর করে দিয়েছে। সেজন্যে ধন্যবাদ দেওয়া ত দূরের কথা একটু ভাল ব্যবহারও কি করতে নেই। একটু দুধে মুখ দিয়ে ফেলেছিল বলে একেবারে চেলা কাঠের বাড়ি মারা। পিঠটা ফুলে উঠেছে। দুত্তোর মানুষ জাতটাই পাজি! ওদের সংসর্গে থাকতে নেই তার চেয়ে বনবাস ঢের ভাল।

আর, বনবাসই বা কেন, বনই ত তার ঘর। সেইখানেই ত তার আত্মীয় স্বজন সব আছে। গাঁয়েই বরং সবাই পর।

এই সময় মুখখানি ভারি বিমর্ষ করে ভুলো তার পাশে এসে বসল পুষি দেখলে, ভুলোর গলায় ছেঁড়া দড়ির ফাঁস তখনো ঝুলছে। সে একটু মুচকি হেসে বললে—'কি ভুলো, বোষ্টম হলি নাকি। গলায় কণ্ঠি পরেছিস যে?

ভুলো উদাস ভাবে বনের দিকে তাকিয়ে রইল। পুষি জিজ্ঞাসা করলে,—বেঁধে রেখেছিল বুঝি? ভুলো সংক্ষেপে বললে—হুঁ।

'কেন? কি করেছিলি?'

ভুলো বিরক্ত হয়ে বললে,—'করব আবার কি—কিছু করিনি। —আচ্ছা, তুইই বল দেখি, তোর ত দু'বছর বয়স হয়েছে, নেহাৎ বোকাও নস্,—বেঁধে রাখলে কেউ কখনো তেজী হয়?'

'দূর' তা কখনো হয়!'

'তবে? আমার মনিবের মাথায় ঢুকেছে যে বেঁধে রাখা হয়নি বলে আমার তেজ কমে যাচ্ছে। কখনো শুনেছিস এমন কথা? বেঁধে রাখলে যদি তেজ বাড়ত তাহলে নিজেরা গলায় দড়ি বেঁধে ঘরে বন্ধ থাকেনা কেন? মানুষগুলো সত্যি আহাম্মক। আমার মনিব কি ঠিক করেছে জানিস? আজ থেকে রোজ দিনের বেলায় আমাকে বেঁধে রাখবে আর রাত্তিরে ছেড়ে দেবে। তাহলেই আমি ভয়ঙ্কর তেজী হয়ে উঠ্‌বো।'

পুষি মনে মনে হেসে বললে,—'তাই বুঝি আজ তোকে দড়ি দিয়ে বেঁধেছিল?'

ভুলো মুখ গোমড়া করে বললে,—'হুঁ। আমিও তেমনি দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে এসেছি।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে,— 'তুই ঠিক বলেছিস পুষি মানুষ গুলোর শরীরে এতটুকু মায়া দয়া নেই। যতই ওদের দেখছি ততই আমার পিত্তি চটে যাচ্ছে।

হু'বেলা হু'মুঠো ভাত দিয়ে ওরা ভাবে যেন আমাদের কিনে নিয়েছে। একটু দরদ নেই, ভালবাসা নেই,—আমরাই কেবল মালিকের জন্যে প্রাণ দিতে ছুটি।' এই সময় একটা কুকুরে-মাছি ভুলোর ঘাড়ের কাছে কটাস্ করে কামড়ে দিতেই ভুলো খিঁচিয়ে উঠ্ল,—'দূর হ'লক্ষ্মীছাড়া!' বলে সামনের হু'পা দিয়ে হাঁচড়-পাঁচড় করে তাকে মারবার চেষ্টা করতে লাগল।

পুষি ভুলোর গা ঘেঁষে এসে গলা খাটো করে বললে,—'ভুলু, চল্ আমরা জঙ্গলে পালাই।'

হঠাৎ মাছি-ধরায় ক্ষান্ত দিয়ে ভুলো বললে,—'অ্যাঁ—?'

পুষি ভুলোর গলার দড়ি খুলে দিয়ে চুপি চুপি বলতে লাগ্ল, —'আমরা ত বনের প্রাণী, বনই আমাদের ঘর। চল্ আমরা এই শয়তান মানুষ গুলোকে ফেলে নিজেদের দেশে চলে যাই। ওরা জব্দ হোক।'

ভুলো বললে,—'কিন্তু—'

পুষি বলতে লাগল,—'এখানে থাকলে তোর মালিক এসে আবার তোকে ধরে নিয়ে যাবে, দড়ি ছিঁড়েছিস বলে মারবে তারপর আবার বেঁধে রাখবে। বুঝেছিস? দরকার কি তোর এত অপমান সহ্য করবার? তার চেয়ে চল্ হুজনে বনের মধ্যে থাক্‌ব, মনের আনন্দে জীব-জন্তু ধরে ধরে খাব—কারুর তোয়াক্কা রাখ্‌ব না। সেখানে ত কেউ আমাদের চেলা-কাঠ দিয়ে মারতেও আসবেনা আর দড়ি দিয়ে বাঁধবেও না। কি বলিস?'

পুষির কথায় ভুলোর মন প্রলুব্ধ হয়ে উঠ্‌ল, তবু সে ইতস্ততঃ করে বললে,—'কিন্তু ভাই, মনিবকে না বলে ছেড়ে যাওয়া, সে যে নেহাৎ'—পুষি বাধা দিয়ে বললে,—'কিসের মনিব? যে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে চায় তার জন্যে আবার দরদ কিসের। এত লাথি ঝাঁটা খেয়েও তোর মনিবের ওপর ছেদ্দা হয়? আমি হলে অমন মনিবের মুখে—'

'চুপ কর—ওকথা বলতে নেই, হাজার হোক সে মনিব। কিন্তু তবু তোর কথাটাও নেহাৎ মন্দ নয়—বলে ভুলো ভাবতে লাগল।

পুষি বললে,—'বেশী ভাবিস্‌নি ভুলু,—চল এই বেলা বেরিয়ে পড়ি। শাস্ত্রে কি বলেছে জানিস ত—শুভস্য শীঘ্রং। এখনো অনেকক্ষণ বেলা আছে, এই বেলা গিয়ে জঙ্গলের ভেতরটা ভাল করে দেখে শুনে নিতে হবে।—চল্‌—ওঠ্‌'। এই বলে পুষি বনের পানে পা বাড়ালে।

'চল তবে'—বলে ভুলোও উঠে দাঁড়াল।

ঠিক এই সময় গাছের ওপর থেকে ভারি গলায় কে বললে,—'ওদিকে যেওনা যাদু, হুতুম থুমোর ভয়।'

পুষি চম্‌কে গাছের দিকে চেয়ে দেখলে একটা টিয়া পাখী বসে আছে। টিয়াটার পায়ে লোহার আংটি, বোধহয় কারুর শিক্‌লি ছিঁড়ে পালিয়েছে। পুষি রেগে উঠে বললে,—'আ মোলো! শুভ কার্য্যে বেরুচ্ছি অমনি পেছু ডাক্‌লি? অযাত্রা কোথাকার! দুর্গা! দুর্গা! আয় ভুলো।' পাখীটা কেবল টর্‌র্‌ করে হাস্‌লে।

দু'জনে তখন বনের মধ্যে গিয়ে ঢুক্‌ল। মানুষের মায়া কাটিয়ে যেতে ভুলোর মনটা একটু বিষন্ন হল বটে কিন্তু আজ সে মালিকের ব্যবহারে প্রাণে বড়ই আঘাত পেয়েছিল, তাই আর গাঁয়ের দিকে ফিরে তাকাল না।

নিবিড় আবছায়া বনের ভিতর দিয়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়ে পুষি আর ভুলো শেষে একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পোঁছুল। একটি ছোট নদী লতাপাতা ঝোপ ঝাড়ের ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে —কিনারার গাছ তার জলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। এখানে গাছের ভিঁড় কম বলে বিকেলের আলোও বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্চে। দুজনে খানিক ক্ষণ বসে জিরিয়ে নিলে; অনেকদূর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এসে তাদের পিপাসা পেয়েছিল, জলের ধারে গিয়ে চক্‌-চক্‌ করে জল খেলে, তারপর একটা গাছের তলায় এসে বস্‌ল।

পুষি এদিক ওদিক তাকিয়ে বল্‌লে,—'ভুলো, বেশ ক্ষিদে পেয়েছে—না রে? এই সময় একটু দুধ পাওয়া যেত!'

ভুলোরও ক্ষিদে পেয়েছিল কিন্তু সে তা বললে না, কেবল একটা 'হুঁ' বলে চুপ করে রইল।

পুষি বললে,—'কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখেছিস? জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এতদূর এলুম, জনপ্রাণীরও দেখা পেলুম না। জঙ্গলে কি কেউ থাকেনা নাকি?'

এই সময় গাছের ওপর থেকে শব্দ হল,—'হুঁসিয়ার! পেছনে তাকাও!'

দু'জনে একসঙ্গে পেছু ফিরে দেখলে একটা প্রকাণ্ড কালো ভাল্লুক পা টিপে টিপে প্রায় তাদের ঘাড়ের কাছে এসে পড়েছে। পুষি ত এক চীৎকার ছেড়ে তড়াক করে গাছের উঠে পড়ল ; কিন্তু ভুলো কি করে ? সে গাছে উঠ্‌তে জানেনা—প্রাণের দায়ে পোঁ পোঁ করে দৌড়ুতে আরম্ভ করল। ভাল্লুকটাও দুলতে দুলতে আর গোঁ গোঁ করতে করতে তার পিছনে পিছনে ছুটল।

পুষি গাছে উঠেই দেখলে, সেই টিয়া ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসছে। পুষি তার কাছাকাছি যেতেই সে দূরের একটা ডালে উড়ে গিয়ে বসল, বললে,—'বনে জনপ্রাণী নেই—কেমন ? তোমরা দু'জনে এখানে এসে রাজত্ব করবে ভেবেছিলে—না ?'

পুষি নীচের দিকে তাকিয়ে বললে,—'বাবা ! খুব বেঁচে গেছি। ভাগ্যিস গাছে উঠ্‌তে জানি, নইলে আমারও ভুলোর দশা হত।'

টিয়া চোখের ওপর পাৎলা পর্দ্দা টেনে দিয়ে বললে,—'ভাল্লুকও গাছে চড়তে জানে—তুমি একলা নয়।'

পুষি ভয় পেয়ে বললে,—অ্যাঁ ! তবে কি হবে ? যদি ভাল্লুক ফিরে আসে ?

টিয়া গলার মধ্যে অবজ্ঞাপূর্ণ টর্‌র্‌ শব্দ করে বল্‌লে,—'এই বুদ্ধি নিয়ে জঙ্গলে বাস করতে এসেছ ? তোমাদের কপালে অনেক দুঃখ আছে।—ভাল্লুক যদি গাছে ওঠে, পাৎলা ডালে গিয়ে বসবে —বুঝলে ? ভাল্লুক সেখানে যাবার চেষ্টা করলেই ডাল ভেঙে পড়ে যাবে।'

পুষি আর দেরী না করে একটি খুব সরু ডালে গিয়ে বসল। কি জানি বলা ত যায়না। সাবধানের মার নেই।

ওদিকে ভুলো চোঁ চাঁ দৌড় দিচ্ছে; কিন্তু ভাল্লুক তাকে ধরলে বলে, আর দেরী নেই। ভাল্লুককে দেখলে মনে হয় না যে সে দৌড়ুতে পারে, কিন্তু তার ঐ ঝাঁকড়া কালো শরীরটা দরকার হলে হরিণের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। ভুলোর আর প্রাণের আশা নেই, সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে ভাল্লুক ঠিক তার দু'হাত পিছনে এসে পড়েছে। হাত বাড়ালেই ধরে ফেল্‌বে।

কিন্তু ঠিক এই সময় এক আশ্চর্য্য ব্যাপার হল। ভাল্লুকটা হাত বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ থপ্‌ করে বসে পড়ল। প্রায় পঞ্চাশ গজ এগিয়ে গিয়ে ভুলো ঘাড় বাঁকিয়ে দেখলে পিছনে ভাল্লুক নেই। সে আরো খানিকদূর গিয়ে থাম্‌ল। ফিরে দাঁড়িয়ে গলা উঁচু করে দেখলে ভাল্লুকটা মাটিতে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে, আর তার ভিতর থেকে একটা শব্দ বেরুচ্ছে—হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—

ভুলো কিছু বুঝ্‌তে পারলে না; সে ভারি আশ্চর্য্য হয়ে অনেকখানি ঘুরে আবার সেই গাছের নীচে গিয়ে হাজির হল। গাছের দিকে তাকিয়ে দেখলে পুষি সরু ডালের ওপর চুপটি করে বসে আছে।

ভাল্লুকের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে ভুলোর বেশ ফুর্ত্তি হয়েছিল, একটু অহঙ্কারও হয়েছিল। সে বললে,—'কি পুষি, গাছের টঙে উঠে বসে আছিস কেন? নেমে আয়। নেমে আয়। তোর মতন ভীতু আর দুনিয়ায় নেই।'

ভুলো যে বেঁচে ফিরে আসবে সে আশা পুষির ছিল না, সে চোখ গোল গোল করে জিজ্ঞাসা করলে,—'আর ভাল্লুক ?'

ভুলো বললে,—"হুঁঃ—ভাল্লুক ! সে কি আর আছে ? তার দফা রফা করে দিয়েছি।"

'সে কি ? মরে গেছে ? কি হয়েছিল ?'

ভুলোর একটা দোষ যে নিজের বীরত্বের বড়াই করতে ভাল বাসে ; বললে,—'মরেনি এখনো—তবে আর দেরী নেই। এমন এক লেঙ্গি মেরেছি তাকে যে আর উঠবার ক্ষমতা নেই—মাটিতে শুয়ে কোঁ কোঁ করছে।'

টিয়া বললে,—'জ্বর এসেছে—জ্বর এসেছে। লেঙ্গি নয় রে, ভাল্লুক জ্বরে ধুঁকছে। ভুলো তুই বড় মিথ্যেবাদী—কুকুর জাতটাই মিথ্যেবাদী।'

ভুলোর একুটু লজ্জা হল, টিয়ার ওপর একটু রাগও হল কিন্তু সে ভাব চেপে গিয়ে বললে,—'পুষি আয়, বড় ক্ষিদে পেয়েছে। শিকার ধরে খাই।'

পুষিরও পেট জ্বলছিল। সে সাবধানে নেমে এসে বললে,—'কি শিকার করবি ? কোথাও যে কিছু নেই।'

ভুলো বললে,—'ওই দিক দিয়ে আসবার সময় দেখলুম কত গুলো খরগোশ দূরে লাফালাফি করে খেলা করছে—চল্ দু'জনে মিলে ধরিগে।'

টিয়া টিট্‌কিরি দিয়া হেসে উঠল,—'হো হো হো ! খরগোশ

ধরবে? আস্পর্দ্ধা দেখে আর বাঁচিনা। থ্যাক্‌শেয়ালী যার সঙ্গে দৌড়ে পারে না, নেকড়ের নাকের তলা দিয়ে যে পালিয়ে যায় তাকে তোমরা ধরবে? হো হো হো! তার চেয়ে টিক্‌টিকি ধরে ধরে খাওগে যাও।'

টিয়ার ওপর মনে মনে চটলেও পুষি আর ভুলো মুখে কিছু বল্‌লে না, কারণ টিয়ার কাছে থেকে অনেক উপকার পাওয়া যেতে পারে। এইমাত্র ভাল্লুকের হাত থেকে সেই প্রাণ বাঁচিয়েছে; তাই কোনো কথা না বলে তারা খরগোশ শিকার করতে চলল।

একটা উঁচু ঢিবির পাশে সারি সারি গর্ত্ত আর তারি সাম্‌নে ফাঁকা জায়গায় তিনটে খরগোশ খেলা করছে। খরগোশেরা ভারি আমুদে,—নাচ্‌ছে, কখনো শূন্যে ডিগবাজি খাচ্ছে, কখনো বা এ ওর পিঠে চড়ে ঘোড়া ঘোড়া খেল্‌ছে।

উঁচু ঘাসের আড়াল থেকে তাদের দেখে ভুলো আর পুষির জিভে জল এল। পুষি ফিস্‌ ফিস্‌ করে বল্‌লে,—'আমরা দু'জনে দুদি্‌ক থেকে ওদের আক্রমণ করি আয়, তাহলে আর পালাতে পারবে না।' দু'জনে গুঁড়ি মেরে দুদিকে চলে গেল।

তারপর একসময় তাক্‌ বুঝে একসঙ্গে দুদিক থেকে তীরের মত আক্রমণ করলে। খরগোশ তিনটে তাদের ছুটে আসতে দেখে একটুও ভয় পেলে না; একটা খরগোশ তার গন্নাকাটা ঠোঁট নেড়ে বললে,—'ওরে দেখ ত, এরা আবার কারা?'

দ্বিতীয় খরগোশটা পুষিকে দেখে বললে,—'এটা বোধ হয় কচ্ছপের ভায়রাভাই নইলে এত আস্তে চলে কেন?'

তৃতীয় খরগোশ পুষিকে দেখে বললে,—'এটা নিশ্চয় কুমীরের ডিমফোটা বাচ্ছা, এখনো চলতে শেখেনি।'

এতক্ষণে পুষি ভুলো একেবারে তাদের কাছে এসে পড়েছিল—ধরে আর কি! কিন্তু এই সময় তিনটে খরগোশই হঠাৎ ডিগ্‌বাজি খেয়ে প্রায় চার-পাঁচ হাত শূন্যে উঠে গেল—ভুলো আর পুষি তাদের ধরতে পারলে না, তলা দিয়ে বেরিয়ে গেল; দৌড় থামিয়ে তারা যখন ফিরে এল তখন খরগোশেরা ধীরে সুস্থে গর্ত্তের মধ্যে ঢুকে পড়েছে আর মিহি সুরে গান ধরেছে—

'আমায় ধরতে পারলি না—ধিন্‌তা ধিনা—'

গর্ত্তের মুখের কাছে বসে ভুলো জিভ্‌ বার করে হাঁপাতে লাগল, পুষি রাগের চোটে দাঁত কড়মড় করে বললে,—'আবার গান হচ্ছে! দাঁড়াও, গর্ত্তে ঢুকে টুঁটি ধরে বার করে নিয়ে আসছি।' গর্ত্তগুলো সরু হলেও পুষি কোনমতে তাতে ঢুকতে পারে।

টিয়া এতক্ষণ তাদের মাথার ওপর উঠে উঠে মজা দেখছিল, পুষি গর্ত্তে ঢুকতে যায় দেখে বললে,—'অমন কাজটি করো না, ও গোলোক ধাঁধাঁয় ঢুকলে আর বেরুতে পারবে না। অনেক মিয়াকেই ওর মধ্যে ঢুকতে দেখলুম কিন্তু কেউ আজ পর্য্যন্ত ফিরে আসেননি।'

গায়ের ঝাল গায়ে মেরে রাগে গরগর করতে করতে পুষি আর ভুলো ফিরে এল। ক্ষিদেয় পেট চুঁই-চুঁই করছিল। নদীর ধারে গিয়ে দুজনে পেট ভরে জল খেলে। কিন্তু জল খেলে কি ক্ষিদে যায়? খানিকক্ষণ পরে পুষি বললে,—'ভুলো, কি খাব? পেট যে জ্বলে যাচ্ছে।'

ভুলো জবাব দিতে পারে না; টিয়া ওপর থেকে বললে,—'টিকটিকি খা—টিকটিকি খা, তোদের কপালে আর কিছু জুটবে না।'

কোথায় খরগোশ কোথায় টিকটিকি! তবু পুষি মুখ তুলে বললে,—'টিকটিকিই বা পাব কোথায় যে খাব?

টিয়া বললে,—'কানা কোথাকার, দেখতে পাচ্ছিস না? ঐ দ্যাখ'—বলে চোখের ইসারা করে দেখিয়ে দিলে।

একটা কাঁটা গাছের ডালে ডালে টিকটিকি বসে ছিল, যেন ঝিঙের ঝাড়ে শুকনো ঝিঙে ঝুলে আছে। তাই দেখে দুজনে লাফিয়ে গিয়ে তাদের ওপর পড়ল। পুষি থাবার এক ঝাপটায় একটা টিকটীকি মাটিতে ফেলে কচ্‌মচ্‌ করে তার মাথা চিবতে লাগল। ভুলোও অতিকষ্টে একটা রোগা টিকটিকি ধরলে, কিন্তু খেতে গিয়ে তার গা বমি-বমি করতে লাগল; তবু পেটের জ্বালায় খেয়ে ফেললে। অন্য টিকটিকি গুলো সর-সর করে নিমিষের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর গাছের কোটরের ভিতর থেকে তাদের টেলিগ্রাফের টরে টক্কা শোনা গেল,—'সাবধান!

হু সিয়ার! টরে টক্কা টরে! একরকম অদ্ভুত জানোয়ার এসেছে; তারা আমাদের ধরে ধরে খাচ্ছে! সাপ নয়—চারপেয়ে জন্তু! হুঁসিয়ার! কেউ গাছ থেকে নেমো না—টরে টরে টক্কা টক্কা—'

দেখতে দেখতে টিকটিকি-মহলে খবর রাষ্ট্র হয়ে গেল।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছিল; বনের অধিবাসীরা ক্রমে জেগে উঠ্ছে তার শব্দও মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছিল। পুষি টিকটিকি ভোজন শেষ করে ঠোঁট চাট্তে চাট্তে বললে,—'পেট ভরল না। আর গোটা দশেক হলে হ'ত।'

ভুলো কিছু বললে না কেবল করুণ ভাবে টিয়ার দিকে তাকিয়ে রহিল—যদি সে কোনো নূতন খাবারের সন্ধান দিতে পারে।

টিয়া পশ্চিম আকাশের দিকে চেয়ে বললে,—'সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, এবার আমি চললুম; রাত হলে আবার প্যাঁচার ভয়।'

টিয়া চলে যায় দেখে পুষি বললে,—'টিয়া, কোথায় খাবার পাওয়া যায় বলনা ভাই। তোদের দেশে নূতন এসেছি, তোরা যদি না সাহায্য করিস তাহলে বাঁচি কি করে?'

পুষি নরম হয়েছে দেখে টিয়া বললে,—'আজ আর হবে না, কাল সকাল পর্য্যন্ত যদি বেঁচে থাকিস তাহলে ভাল খাবারের সন্ধান দেব। এখন যা, কোনো গর্ত্ত-টর্ত্ত দেখে লুকিয়ে থাকগে যা।'

পুষি মিনতি করে বললে,—'লক্ষ্মী ভাই, আজ যদি কিছু খেতে না পাই তাহলে শুকিয়ে মরে থাকব। জানিস ত, আমার দু'বেলা

আধ সের করে দুধ খাওয়া অভ্যেস। তার ওপর ভাত, মাছ, ইঁদুর আরও কত কি আছে।'

ভুলো কেবল লালায়িত জিভ বার করে টিয়ার পানে চেয়ে রহিল।

তাদের অবস্থা দেখে টিয়ার মনে দয়া হল, সে একটু ভেবে বললে,—'ভাল খাবারের সন্ধান দিতে পারি। কিন্তু তোরা সেখানে যেতে পারবি? ভয়েই মরে যাবি।'

ভুলো লাফিয়ে উঠে বললে,—'মরব না। বল না কোথায়?'

টিয়া বললে,—'ঐ পশ্চিম দিকের শালবনের মধ্যে। বাঘ একটা হরিণ মেরে রেখে গেছে, আজ এসে খাবে। পারবি সেখানে যেতে? এ বনের কোনো জন্তু কিন্তু বাঘের খাবারে মুখ দিতে সাহস করে না।'

পুষি ল্যাজ ফুলিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—'তুই বোধ হয় জানিস না, আমি সম্পর্কে বাঘের মাসি হই। ও হরিণ আমার জন্যেই আমার বোন্‌পো মেরে রেখে গেছে। এতক্ষণ বলিস নি কেন? চল্‌ চল্‌ শিগ্‌গির আমাকে সেখানে নিয়ে চল, আর দেরী করিস নি।'

টিয়া তখন টি টি করে হাসতে হাসতে পথ দেখিয়ে উড়ে চলল, ভুলো আর পুষি তার পিছনে পিছনে গেল।

শাল বনের কাছে গিয়ে টিয়া বললে,—'এবার তোরা যা, আমি বাসায় চললুম। কাল যদি বেঁচে থাকিস ত দেখা হবে।'

এই বলে সোজা নদীপার হয়ে উড়ে চলে গেল।

শালবনের মধ্যে ঢুকেই পুষি আর ভুলো মরা হরিণের গন্ধ পেলে। পুষি বললে,—'দেখেছিস, আমার বোনপো আমায় কত ভালবাসে? আগে থাকতে উয্যুগ আয়োজন করে রেখেছে।'

ভুলোর তখন পুষির কথায় মন ছিলনা, এদিক ওদিক চাইতেই দেখলে, আধখাওয়া হরিণটা পড়ে রয়েছে। সে উচ্চ-বাচ্য না করে খেতে আরম্ভ করে দিলে। পুষি আহ্লাদে আটখানা হয়ে ঘুরে ফিরে হরিণটার কোথায় নরম মাংস তাই খুঁজতে লাগল আর বল্‌তে লাগল,—'উঃ, বোনপো আমাকে কি ভালোই বাসে! হাজার হোক দীর্ঘদন্ত ঠাকুরের সন্তান ত—উঁচু মেজাজ। খেয়ে নে ভুলো পেট ভরে, আমার পয়েই আজ খেতে পেলি।'

ভুলো কোঁৎ কোঁৎ করে খেতে খেতে বললে,—'খা খা, বেশী বাজে বকিস্ নি। বাজে কথা বলা তোর একটা অভ্যাস।'

পুষি জিভ্ দিয়ে একটু রক্ত চেটে বললে,—'খাচ্চি। তোর মতন অমন হাঁউ হাঁউ করে খেলে আমার সুখ হয়না।—কি সুন্দর হরিণের মাংস—যেন তুল্‌তুল্ করছে।' বলে পুষি একটুখানি মাংস ছিঁড়ে নিয়ে খেতে লাগল।

এতক্ষণে একেবারে অন্ধকার হ'য়ে গিয়েছিল, শালবণের মধ্যে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। ভুলোর পেট যখন বেশ ভরে এসেছে—তখনো পুষি ভাল করে আরম্ভ করেনি—এমন সময় 'গাঁক্' করে একটা বিকট শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে মড়মড় শব্দ—যেন ঝোপঝাড়

ভেঙে কে ছুটে আসছে! দু'জনে ফিরে দেখলে আগুণের ভাঁটার মতন দুটো চোখ অন্ধকারের ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসছে।

তারপরেই গর্জ্জন শুনলে,—'কে রে! কে রে! আমার খাবারে মুখ দিয়েছে কোন্ হতভাগা! আজ তার বুক চিরে মেটুলি বার করব।' তারপর আবার গাঁক্ গাঁক্ শব্দ।

শুনেইত পুষির গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠ্‌ল, সে ল্যাজ উঁচু করে পোঁ পোঁ করে দৌড় দিলে। ভুলোও দৌড়ে কম নয়—দুজনে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে মরি-কি-বাঁচি করে পালাতে লাগ্‌ল।

রাত্রে বেরাল কুকুর দেখতে পায় বটে কিন্তু বনের রাস্তা ঘাট তাদের পরিচিত ছিলনা, তার ওপর বাঘ পিছনে তাড়া করে আসছে। তাই দুজনে যে কোথায় যাচ্চে তার ঠিকানা ছিলনা। প্রাণের দায়ে খালি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ুচ্ছিল।

পালাতে পালাতে হঠাৎ তারা ঝুপ করে জলের মধ্যে পড়ে গেল। পুষি হাবুডুবু খেতে খেতে বললে,—'গেলুম রে, বাবারে, ও ভুলো এ কোথায় পড়লুম? কুয়ো নয় ত?' পুষি আগে একবার কুয়োয় পড়েছিল, সেই থেকে তার কুয়োয় বড় ভয়।

ভুলো চারপায়ে সাঁতার দিতে দিতে বল্‌লে,—'কুয়ো নয়—নদী। সাঁতার কাট্—সাঁতার কাট্।'

জলে হাবুডুবু খেয়ে নদীর কিনারা কোন্‌দিকে তা তারা দেখতে পেলেনা, তবু সাঁতার কেটে চলল। ক্রমে নদীর স্রোত

তাদের টেনে নিয়ে চল্‌ল। খানিক পরে তারা শুনতে পেলে বাঘ তীরে দাঁড়িয়ে হেঁড়ে গলায় বলছে,—'খুব বেঁচে গেলি—যা।'

এতক্ষণে ভুলো আর পুষি বেশ দেখতে পাচ্ছিল, তারা আর তীরের দিকে গেলনা ; তীর থেকে বিশ পঁচিশ হাত দূরে স্রোতের মাঝখান দিয়ে ভেসে চলল। ক্রমে নদীর ঠিক মাঝামাঝি একটা উঁচু পাথর জেগে আছে দেখতে পেলে। ভুলো বললে,—'ঠিক হয়েছে, আজ এইখানেই রাত কাটাব। বেশ হবে, কেউ আর কাছে আস্‌তে পারবে না।' এই বলে ছোট্ট দ্বীপের মতন সেই পাথরটার দিকে সাঁতরে চল্‌ল।

দু'জনে সেখানে গিয়ে উঠ্‌তেই এককুড়ি ব্যাং কট্‌-কট্‌ করে আপত্তি জানিয়ে জলে লাফিয়ে পড়ল।

পুষি বেচারি ভিজে একেবারে আধখানি হয়েছিল, সে একটা উঁচু শুক্‌নো যায়গায় উঠে বসে হিঁ হিঁ করে কাঁপ্‌তে লাগল। ভুলোও ভাল করে গা ঝাড়া দিয়ে তার পাশে এসে বসল, বললে, 'কি পুষি, দীর্ঘদন্ত ঠাকুরের সন্তানকে দেখে অমন ল্যাজ তুলে পালিয়ে এলি কেন? তোর বোনপো হয়, তোকে দেখলে গড় হয়ে পেন্নাম করে পায়ের ধুলো নিত, তা দিলিনা কেন? তোর জন্যে কত উয্যুগ করে রেখেছিল—একটু মুখেও দিলি না?'

পুষি চুপ—মুখে কথাটি নেই। ভুলোর পেট ভরা ছিল, সে একটা ঢেকুর তুলে বললে,—'আচ্ছা, তোর বোনপো তোকে সত্যিই

ভালবাসে; নদীর ধার পর্য্যন্ত ডাকতে এসেছিল। গেলিনে কেন রে?'

পুষি ফ্যাঁচ্ করে হাঁচ্‌লে,—জলে ভিজে তার ঠাণ্ডা লেগে গেছে। সে মনে মনে ভাবতে লাগল উনুনের ধারের সেই গরম যায়গাটির কথা সেখানে সে রোজ সন্ধ্যেবেলা বসে ঘুমুত। নিজের দুর্ব্বুদ্ধির দোষে খাবার পেয়েও আজ খেতে পারেনি,—ভুলোটা পেট পুরে খেয়ে নিয়েছে—তাতেই তার আরো মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর ভুলো এমন ঠাট্টা স্থুরু করে দিয়েছে যে সহ্য করা দায়। পুষি বুকের মধ্যে ঘাড় গুঁজে চুপটি করে বসে রইল।

ক্রমে রাত গভীর হতে লাগল; ভুলো লম্বা হয়ে শুয়ে ঘুমুবার আয়োজন করলে। কিন্তু নুতন যায়গায় ঘুম সহজে আসেনা, এলেও ভেঙে যায়। নদীর দুই কিনারায় নানারকম জন্তু জল খেতে আসছে, তাদের ডাকাডাকিতে তন্দ্রা চটে যেতে লাগল। একবার একটা পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড হাতী শুঁড় দিয়ে চোঁ চোঁ করে জল টেনে নিয়ে নিজের গলায় ঢেলে দিলে তারপর ভেঁপু ভেঁপু করে ডাক দিয়ে দুল্‌তে দুল্‌তে চলে গেল। তারপরে হরিণ এল, শূয়ার এল, ভাল্লুক এল,—সবাই জল খেয়ে গেল। শেয়াল জল খেতে এসে বললে,—'কেরে তোরা, নদীর টিলাতে ঘুপ্‌টি মেরে বসে আছিস?'

এরা জবাব দিলে না, শেয়াল তখন ভাল করে লক্ষ্য করে

বললে,—'আরে, এ যে পুষি আর ভুলো ! আ মোলো ! তোরা মরতে বনে এসেছিস কেন ?'

ভুলো পুষি কথা কইলে না, শেয়াল তখন খ্যাঁক্-খ্যাঁক্ করে হেসে বললে,—'কি রে ভুলো, এক্কেবারে বোবা হয়ে গেলি যে ! আর, আমি গাঁয়ের সীমানায় পা দিতে না দিতে যে ঘেউ ঘেউ করে গাঁ মাথায় করিস ! এখন ?' এই বলে নদীর ধারে উপু হয়ে বসে শেয়াল মুখ উঁচু করে গান ধরলে। ইতিমধ্যে আরো অনেক শেয়াল এসে জুটেছিল, তারা দোয়ারকি সুরু করলে,—

'গাঁয়ের ভুলো ছিল গাঁয়ের গো-ভাগাড়ে
ঘরের পুষি ছিল ঘরে—
হঠাৎ একি হল ! নদীর মাঝখানে
বসেছে টিলাটির পরে !
গাঁয়ের পোষা প্রাণী—খাস ত দুদু-ভাতু
কেন রে এসেছিস বনে ?
এখানে থাকি মোরা স্বাধীন জাতি-সব
বাঘা ও ভালুকের সনে।
গাঁয়েতে আছে শুধু মানুষ গরু-ভেড়া
আগুন ঘুঁটে আর ধোঁয়া ;—
আমরা বনে থাকি স্বাধীন বেপরোয়া
—হুক্কা হুয়া হুয়া হুয়া !

সমস্ত রাত্রি তারা এই গান গাইলে। গান শুনে পুষি আর

ভুলোর ভারি লজ্জা হল। মনে মনে ভাবলে, প্রাণ যায় সে ও ভাল, তবু আর গাঁয়ে ফিরে যাব না।

ক্রমে অন্ধকার রাত্রি কেটে গেল, পূব দিকে ঊষার রাঙাশাড়ী গাছপালার মাথার উপর দুলতে লাগল। দু'একটা পাখী বাসা থেকে উড়ে এসে গান গেয়ে উঠ্‌ল। সকাল হয়ে আসছে দেখে শেয়ালেরা গান বন্ধ করে বনের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বেশ পরিষ্কার হতেই টিয়া উড়তে উড়তে এসে হাজির হল, বললে,—'আরে, তোরা এখানে! এখনো বেঁচে আছিস? বেশ বেশ, তোদের ভাগ্যি ভাল।—তা, এখন কিনারায় চল, সকাল হয়েছে এখন আর তত ভয় নেই।'

দুজনে তখন সাঁতরে কিনারায় উঠ্‌ল। পুষি চিঁ চিঁ করে বললে,—'টিয়া ভাই, কাল থেকে কিছু খাইনি, মুখ দিয়া কথা বেরুচ্ছে না।'

টিয়া বললে,—'কেন, কাল হরিণের মাংস খাস্‌নি?'

পুষি লজ্জায় মাথা হেঁট করে বললে,—'সবেমাত্র খেতে বসেছি, এমন সময়—'

ভুলো গম্ভীর মুখ করে বললে,—'এমন সময় বোন্‌পো এসে পড়ল, তাই পুষি জিভ্‌ কেটে উঠে পড়ল। ছেলেপুলের খাওয়া না হলে মা-মাসির খেতে নেই জানিস ত?' বলে ভুলো টিয়ার দিকে চোখ টিপ্‌লে।

টিয়া হেসে বললে,—'আহা,কাল তাহলে পুষির নিরম্বু একাদশী

গেছে! আহা, আয় পুষি, আজ তোর দ্বাদশীর পারণ করাব।' বলে উড়ে চলল।

তখন সূর্য্য উঠেছে। টিয়ার পিছনে পিছনে দু'জন গভীর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পৌঁছুল। চারিদিকে বড় বড় গাছ—থামের মতন তাদের গুঁড়ি ওপরে উঠে গেছে, তার ওপর ডালপালা আর পাতার ঘন ছাউনি, এত ঘন যে আকাশ দেখা যায় না। টিয়া একটা গাছের ডালে বসে বললে,—'পুষি, এই গাছে ওঠ।'

পুষি অবাক হয়ে বললে,—'কেন, গাছে উঠে কি হবে?'

টিয়া বললে,—'এই গাছের মগডালে বাজ পাখীর বাসা আছে, তাতে ছানা আছে। তুই উঠে আয়, এখন তারা শিকারে বেরিয়েছে, এই বেলা তাদের ছানা খেয়ে তাদের বংশ নির্ব্বংশ করে দে। ওরা আমাদের শত্রু—জ্ঞাতি-শত্রু—ওদের ডিম-ছানা খেয়ে শেষ করে দে। এ বনে যত বাজ পাখী আছে সকলের বাসায় আজ তোকে নিয়ে যাব।'

পুষি আর দ্বিরুক্তি না করে গাছে উঠ্তে উঠ্তে বললে,— 'টিয়া, তুই ভাবিস নি, তোর সব শত্রু আমি নিপাত করব। সত্যি কথা বলতে কি, পাখীর কচি-কচি ছানা খেতে আমি বড্ড ভালবাসি।

ভুলো নীচে থেকে বললে,—'আমিও। পুষি তুই একাই টিয়ার সব শত্রু নিপাত করিস নি, আমাকেও দু'একটা নিপাত করতে দিস।'

পুষি তখন অনেক ওপরে উঠে গেছে, অবজ্ঞাভরে নীচের দিকে তাকিয়ে বললে,—'পাত কুড়োনো হাড় গোড় যদি কিছু থাকে, ফেলে দেব অখন।'

তারপর একে একে দশটা গাছে উঠে বাজ পাখীর বাসায় যত ডিম আর ছানা ছিল পুষি সব সাবাড় করলে। ভুলো তলা থেকে যে প্রসাদ পেলে তাইতেই তার পেট ভরে গেল। শেষে আই-ঢাই করতে করতে পুষি নেমে এসে মাটিতে বসল।

টিয়া শত্রুর প্রতিহিংসা সাধন করে মনের আনন্দে একটি পাকা তেলাকুচো ডানহাতে ধরে খাচ্ছিল, বললে,—'কি পুষি, পেট ভরল?'

পুষি প্রকাণ্ড একটা হাই তুলে আলিস্যি ভেঙে বললে,—'হ্যাঁ। এখন একটু নিরিবিলি দেখে ঘুমুতে পারলে হয়।'

টিয়া তখন আধখাওয়া তেলাকুচোটা ফেলে দিয়ে গম্ভীরভাবে বললে,—'শোন্ পুষি, এবার আস্তে আস্তে নিজের গাঁয়ে ফিরে যা, এ বনে আর থাকিস নি। তোদের ভালর জন্যই বলছি, আমি ত আর অষ্ট প্রহর তোদের সঙ্গে থাকতে পারবনা। বনে যদি তোরা আর এক রাত্রি কাটাস তাহলে হুড়ার কিম্বা বাঘের পেটে যাবি।'

পুষি টিয়ার কথায় কাণ না দিয়ে বললে,—'চল ভুলো, কোথাও শুয়ে একটু ঘুমুনো যাক। কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি।'

টিয়া আবার বললে,—'পুষি ভুলো, আমার কথা শোন্, এখনো

ফিরে যা, সন্ধ্যে নাগাদ গাঁয়ে পৌঁছুতে পারবি। আমিও একদিন মানুষের ঘরে ছিলুম, দাঁড়ে বসে ছোলা খেতুম। মানুষ জাতটা খামখেয়ালী বটে কিন্তু একেবারে হৃদয়হীন নয়। এখানে চারদিকে বিপদ'—জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ, গাছে ভাল্লুক-বাঁদর। সবাই নিজের নিজের পেট ভরাবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোরা বনের হালচাল জনিস না—বেঘোরে মারা যাবি।'

সকাল থেকেই ভুলোর মালিকের জন্যে মন কেমন করছিল, টিয়ার উপদেশ তার বড় ভাল লাগল। সে একটু কেশে বললে, 'পুষি, টিয়া যা বলছে তা মিথ্যে নয়; চল ফিরে যাই—'

পুষির কিন্তু পেট ভরা ছিল, ভরা-পেটে পুষি কারুর কথা শোনেনা; সে বললে,—'তোর যেতে হয় যা, আমি এখন ঘুমুতে চললুম। গাঁয়ে ফিরলেই ত আবার সেই লাথি ঝাঁ্যাটা।' বলে সে আর একটা আড়িমুড়ি ভেঙে উঠে দাঁড়াল।

টিয়া ওপর থেকে বললে,—'গুরুর কথা না শোনো কাণে, প্রাণটি যাবে হ্যাঁচ্কা টানে! যা ভাল বুঝিস কর, আমি এখন চললুম, আমার ছানাদের খাওয়ানোর সময় হল।'

এই বলে টিয়া টি টি করে ডেকে উড়ে গেল।

এতক্ষণে প্রায় দুপুর হয়েছে, সূর্য্যের কিরণ সরু সূতোর মতন পাতার ফাঁকে মাটিতে এসে পড়েছে। পুষি আর ভুলো ঘুমুবার একটা যায়গা খুঁজতে খুঁজতে শেষে বেশ একটি গরম অথচ নিরিবিলি ঝোপের মধ্যে এসে পৌঁছুল। ঝোপের মধ্যে একটা

লম্বা গাছের গুঁড়ি পড়ে ছিল। পুষি তার সামনে খানিক দূরে একটা পরিষ্কার যায়গায় গুড়িসুঁড়ি পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। ভুলোর কিন্তু মন ছট্‌ফট্‌ করছিল, সে শুলো না, এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল। গ্রাম যে কোন্‌দিকে, বনের মধ্যে এত দৌড়া-দৌড়ি করবার পর তা গুলিয়ে গিয়েছিল, তাই গাছপালা শুঁকে সে দিক্‌ নির্ণয়ের চেষ্টা করতে লাগল।

ওদিকে পুষির বেশ ঘুম এসে গিয়েছে, সে চোখ বুজে স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করে দিয়েছে, এমন সময় তার মনে হল যেন আগুনের হল্কার মতন একটা নিশ্বাস তার গায়ে এসে লাগল, আর সেই সঙ্গে শুনতে পেলে কে যেন তার কানে কানে বলছে,—'চলে আয়—আমার মুখের মধ্যে চলে আয়!'

পুষি ধড়মড়িয়ে উঠে চোখ চেয়ে দেখলে সেই গাছের গুঁড়িটা প্রকাণ্ড এক হাঁ করেছে, আর দুটো গোল গোল নৃশংস চোখ একদৃষ্টে তার পানে তাকিয়ে আছে।

আবার সেই গরম নিশ্বাস পুষির গায়ে লাগল, আবার সে শুনতে পেলে,—'চলে আয়,—আমার মুখের মধ্যে চলে আয়!'

পুষির মনে হল সেই নিষ্পলক নির্ম্মম চোখ দুটো তাকে সেই হাঁ-করা মুখের দিকে টান্‌ছে। তার পালাবার ক্ষমতা নেই। পুষি অবশভাবে এক পা সেইদিকে এগিয়ে গেল, তারপর মর্ম্মান্তিক আতঙ্কে চীৎকার করে উঠ্‌ল,—'ম্যা—ও!'

ভুলো দূর থেকে সেই ভয়ার্ত্ত ডাক শুনতে পেয়ে ছুটে এল।

তারপর পুষির সামনে প্রকাণ্ড হাঁ-করা মুখ দেখেই বুঝলে পুষি অজগরের সম্মোহন দৃষ্টির ফাঁদে পড়েছে। কাছে যেতে ভুলোর সাহস হলনা। সে দুর থেকে ঘেউ ঘেউ করে কয়েকবার ডাকলে, —কিন্তু তাতে কোনো ফল হলনা, অজগরের চক্ষু পুষির ওপর থেকে এক চুল নড়ল না।

ভুলোর তখন মাথায় এক বুদ্ধি গজালো। হাজার হলেও পুষি তার বন্ধু, যেমন করে হোক তার প্রাণ বাঁচাতে হবে।

ভুলো ছুটে গেল অজগরের ল্যাজের দিকে, দেখলে ল্যাজের সরু ডগাটি কেবল লিক্-লিক্ করে নড়ছে। ভুলো প্রাণ পণে ল্যাজের ডগায় মারলে এক কামড় !

ল্যাজে কামড় খেয়ে অজগরের চোখ মুহূর্ত্তের জন্য পুষির চোখ থেকে সরে গেল। ব্যস্—সঙ্গে সঙ্গে পুষি একলাফে তিনহাত পেছিয়ে গিয়ে দৌড় মারলে। পুষি পালিয়েছে দেখে ভুলোও ল্যাজ ছেড়ে দিয়ে পুষির সঙ্গে দৌড়ুল।

ছুট ! ছুট ! বন-বাদাড় পেরিয়ে, খানা-নালা ডিঙিয়ে দুজনে ছুটল। কাঁটায় গা ছড়ে গেল, পা কেটে গেল কিন্তু সেদিকে কারুর লক্ষ্য নেই। তাদের ভয়, সেই অজগরটা না ধরে ফেলে।

পুষি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে,—'হে মা ষষ্ঠী, এই বারটি রক্ষে কর মা, আর কখখনো এ পোড়া বনের ধারে আসব না। এই বারটি উদ্ধার কর।'

কিন্তু তাদের দূর্গতি তখনো শেষ হয়নি। অন্ধের মতন দৌড়ুতে দৌড়ুতে তারা পড়ল গিয়ে একপাল বীর হনুমানের মধ্যে। হনুমানেরা একটা ফাঁকা জায়গায় গোল হয়ে বসে মীটিং করছিল। একটা গোদা গম্ভীর ভাবে লেক্‌চার দিচ্ছিল, এমন সময় পুষি আর ভুলো হুড়মুড় করে পড়্‌ল গিয়ে একেবারে তাদের মাঝখানে। হনুমানেরা চম্‌কে উঠ্‌ল। একটা গোদা পুষির ল্যাজ ধরে টান মেরে তাকে দূরে ফেরে দিলে, আর একটা গোদা মারলে ভুলোর গালে টেনে এক থাব্‌ড়া। ভুলোর-ত মুণ্ডু ঘুরে গেল; সে গড়াতে গড়াতে উঠে আবার ছুটতে আরম্ভ করে দিলে, পুষিও 'ম্যা—ও' করে এক চীৎকার করে তার সঙ্গে সঙ্গে ছুট্‌ল।

হনুমানেদের মীটিংয়ে বিঘ্ন হওয়ায় তারা ভীষন চটে গিয়েছিল, তা ছাড়া কুকুর বেরাল তাদের চিরদিনের শত্রু। তারা হুপহাপ করে পুষি আর ভুলোকে তাড়া করলে।

দেখতে দেখতে বনের যেখানে যত হনুমান ছিল সবাই এসে পড়ল, তারাও কেউ গাছের ডালে ডালে কেউবা মাটি দিয়ে পুষি ভুলোর পিছনে তাড়া করলে। পুষি একবার পেছু ফিরে দেখলে, কাতারে কাতারে হনুমান দাঁত খিঁচিয়ে ছুটে আসছে।

দৌড়ুতে দৌড়ুতে ক্রমে ভুলোর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, পুষির প্রাণ কণ্ঠার কাছে এসে ধুক্ ধুক্ করতে লাগল। পুষি হাঁপাতে হাঁপাতে বললে,—'ভুলো, আর দৌড়ুতে পারছি না, এবার গেলুম।'

ভুলোরও আর পা চলছিল না, সে কথা কয়ে শক্তিক্ষয় করলে না। যতক্ষণ ক্ষমতা আছে ততক্ষণ দৌড়ুবে এই মনে করে সে ক্লান্ত পা'গুলোকে জোর করে চালাতে লাগল।

এদিকে হনুমানগুলো ক্রমেই কাছে এসে পড়ছে—আর আশা নেই! তাছাড়া, পালিয়ে যাবেই বা কোথায়? শেষ পর্য্যন্ত তারা ধরে ফেল্‌বেই। তবে আর কেন মিছিমিছি পালাবার চেষ্টা—তার চেয়ে লড়ে মরা ভাল।

ভুলো ফিরে দাঁড়াবে মনে করছে এমন সময় একটা ঝাঁকড়া গাছের ফাঁকে তার চোখ পড়ল—

গ্রাম! গ্রাম! তাদের গ্রাম! ঐ যে দূরে ফুসের ছাউনি দেওয়া ঘরগুলি পড়ন্ত রৌদ্রে দেখা যাচ্ছে!

ভুলো ঘেউ করে একটা আনন্দ ধ্বনি করে বললে,—'পুষি আর একটু—আর একটু দৌড়ে চল। আমাদের গাঁয়ে এসে পড়েছি।'

পুষি চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু ভুলোর কথা শুনে তার আশা হল, সে দুম্‌ড়ে-পড়া পা গুলোকে আবার প্রাণপণে চালাতে লাগল।

দশ মিনিট পরে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় একহাত জিভ্ বার করে ধুঁক্‌তে ধুঁক্‌তে পুষি আর ভুলো সেই গাছের তলায় এসে বসল,—যে-গাছের তলা থেকে আগের দিন দুপুর বেলা তারা যাত্রা সুরু করেছিল। হনুমানেরা বনের কিনারা পর্য্যন্ত এসে দাঁত খিঁচিয়ে গালাগাল দিতে দিতে ফিরে গেল।

পুরো একটি ঘণ্টা জিরিয়ে নিয়ে পুষি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল। বনের দিকে ফিরে ল্যাজটি গলায় দিয়ে গড় হয়ে নমস্কার করে বললে,—'এই তোমাকে গড় করছি—যতদিন বেঁচে থাকব আর ওমুখো হব না।—চল্ ভুলো বাড়ী যাই।'

ভুলো কিন্তু একটু লজ্জা-লজ্জা করতে লাগল, মনিবের সঙ্গে বেইমানী করেছে এই ভেবে সে অধোবদন হয়ে রইল।

পুষি লজ্জার বালাই নেই, সে বললে,—'চল না, বসে রইলি কেন? ভয় করছে বুঝি?'

ভুলো বললে,—'ভয় করছে না। কিন্তু মনিবের কাছে কি করে মুখ দেখাব ভাই?'

পুষি বললে,—'এই জন্যে তোর ভাবনা? কিছু ভাবিসনে, আমি বল্‌ব অখন যে তোকে পাহারাদার নিয়ে আমি বোনের বাড়ী নেমন্তন্ন রাখ্‌তে গিয়েছিলুম।—আয়।'

এই বলে পুষি গজেন্দ্রগমনে, যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে গাঁয়ের দিকে চলল। ভুলোও ঘাড়টি নীচু করে অপরাধীর মতন তার পিছনে পিছনে গেল।

পরীর চুমু

অনেক অনেক দিন আগেকার কথা। তখন চাঁদ থেকে ছোট্ট ছোট্ট পরী নেমে এসে পৃথিবীতে খেলা ক'রে বেড়াত। বনের মধ্যে চাঁদের আলোয় কেউ কেউ তাদের দেখ্‌তে পেত' ;—মৌমাছির মত স্বচ্ছ পাত্‌লা ডানা মেলে তা'রা উড়ে উড়ে খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে। মানুষ দেখ্‌লেই তারা বনের অন্ধকারে লুকিয়ে পড়্‌ত' ; আর তাদের দেখা যেত' না।

যে বনের মধ্যে পরীরা খেলা করতে আস্‌ত' সেই বনের ধারে একটি বাড়ী ছিল ; বাড়ীতে একটি ছেলে থাক্‌ত' তার নাম মঞ্জু—মঞ্জুর বয়স মোটে ছয় বছর, কিন্তু তার মনে ভারি দুঃখ ; বাড়ীতে তার খেলার সাথী একটিও নেই। মা-বাবা আছেন বটে, কিন্তু তাঁরা মঞ্জুর সাথে খেলা করেন না। মঞ্জু বাড়ীর মধ্যে একলাটি ঘুরে বেড়ায় ; আর একটু সুবিধা পেলেই বনের মধ্যে পালিয়ে যায়। বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে তার বড় ভাল লাগে। সেখানে তার খেলার সাথী কেউ নেই বটে, কিন্তু বনের যত পশুপক্ষী সবাই মঞ্জুকে বড্ড ভালবাসে ;—খরগোসেরা মঞ্জুকে দেখে লাফালাফি ক'রে তাকে ঘিরে নাচে ; কাকাতুয়া উঁচু গাছের ডাল থেকে গলা বাড়িয়ে কথা কয় ; কাঠবেরালী পাকা ফলটি তার পায়ের কাছে ফেলে দেয় ; ফড়িং লাফিয়ে লাফিয়ে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে

যায়। এরা সবাই মঞ্জুর বন্ধু, কিন্তু তবু একটি মানুষ বন্ধুর জন্যে মঞ্জুর মন কেমন কর্‌তে থাকে।

বনের মধ্যে কেবল একটা রূপী-বানর আছে, সে মঞ্জুকে দেখ্‌তে পারে না! মঞ্জুর সঙ্গে দেখা হ'লেই সে ওপর থেকে তাকে মুখ ভ্যাংচায়, কিচির্‌-মিচির্‌ ক'রে ঝগড়া করে। মঞ্জুও তাকে ঢেলা ছুঁড়ে মারে—তখন সে এ-ডাল থেকে ও-ডালে লাফিতে লাফাতে পালায়।

আবার মঞ্জুকে বিপদে ফেল্‌বার জন্যে রূপী-বানরটা জঙ্গলের মধ্যে গর্ত্তের ওপর লতাপাতা ঢাকা দিয়ে ফাঁদ পেতে রাখে যাতে মঞ্জু তার মধ্যে পড়ে যায়। কিন্তু মঞ্জু সে সব গর্ত্তে পড়ে না। ফড়িং তাকে সাবধান ক'রে দেয়, বলে,—'হুসিয়ার! ওদিক দিয়ে যেও না, দুষ্টু রূপীটা তোমার জন্যে ফাঁদ পেতে রেখেছে!' রূপী তাই শুনে গাছের ডাল থেকে মুখ বিকৃতি করে ফড়িংকে গালাগালি দেয়। রূপী ভারি বজ্জাত।

একদিন মঞ্জু বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল,। সে-দিন কিন্তু ফড়িং কাকাতুয়া খরগোস কাঠবেরালী কারুর সঙ্গে তার দেখা হ'ল না। ফড়িং এর বোধ হয় বাচ্ছা হয়েছে, তাই সে বেরুতে পারে নি; খরগোসেরা রাত্রে চাঁদের আলোয় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত লুকোচুরি খেলেছিল, তাই তাদের ঠাণ্ডা লেগে গেছে—তা'রা গর্ত্তের মধ্যে গলায় গলাবন্ধ জড়িয়ে শুয়ে আছে। কাকাতুয়াদের বনের অন্য ধারে সভা বসেছিল—তা'রা সবাই সেখানে গিয়েছে। কাঠবেরালী

তার ছোট্ট খোকার জন্যে ফল খুঁজিতে বেরিয়েছিল,—শুক্‌নো ফল খেয়ে খেয়ে খোকার অরুচি হয়েছে, তাই তাজা ফল খাবার জন্যে সে বায়না ধরেছে।

একলা বনে ঘুরে বেড়াতে মঞ্জুর মন উদাস হ'য়ে গেল'। সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল' আহা, আমার যদি একটি খেলার সাথী থাক্‌ত'; দু'জনে মিলে কেমন খেলা কর্‌তুন!

এই কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে মঞ্জু চলেছিল, হঠাৎ সে একটা গর্ত্তের মধ্যে প'ড়ে গেল'। দুষ্টু রূপীটা গর্ত্তের মুখ এমন ভাবে লতাপাতা দিয়ে ঢেকে রেখেছিল যে, কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। গর্ত্তের মধ্যে প'ড়ে গিয়ে মঞ্জু আবার ওঠ্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল; কিন্তু চৌবাচ্চার মত গর্ত্তের ধারগুলো এমন উঁচু আর খাড়া যে, সে উঠ্‌তে পারলে না। রূপীটা আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে গাছের ডাল থেকে ঝুঁকে কিচ্‌মিচ্‌ ক'রে বল্‌তে লাগ্‌ল'—"কেমন মজা! এবার বাড়ী যাবি কেমন ক'রে? বেশ হয়েছে, এখন গর্ত্তের মধ্যে ব'সে থাক। কেমন জব্দ। আর বনের মধ্যে আস্‌বি?"

প'ড়ে গিয়ে মঞ্জুর হাঁটুতে একটু লেগেছিল; সে বসে হাঁটুতে হাত বুলাতে লাগ্‌ল আর ভাব্‌তে লাগ্‌ল—কি ক'রে সে বাড়ী যাবে! তার মা তাকে অনেকক্ষণ দেখ্‌তে না পেয়ে কত ভাব্‌বেন, তার বাবা বনে বনে খুঁজে বেড়াবেন। ক্রমে রাত্রি হবে, চারিদিক্‌ অন্ধকার হ'য়ে যাবে। তার বিছানাটি খালি প'ড়ে থাক্‌বে। মা কাঁদ্‌বেন, 'মঞ্জু! মঞ্জু!' ব'লে ডাক্‌বেন। কিন্তু সে সাড়া দিতে

পার্‌বে না। এম্‌নি কত রাত কেটে যাবে—তবু সে এই গর্ত্তের মধ্যে প'ড়ে থাক্‌বে—বেরুতে পার্‌বে না!

ভাব্‌তে ভাব্‌তে মঞ্জুর ভারি কান্না পেতে লাগ্‌ল'; সে চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে ফোঁপাতে লাগ্‌ল, আর মনে মনে ডাক্‌তে লাগ্‌ল—'মা! মা! মা!'

তারপর, অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কখন মঞ্জু ঘুমিয়ে পড়্‌ল'।

ঘুম ভাঙ্‌তেই ওপরদিকে চোখ তুলে মঞ্জু দেখ্‌লে—একটি ছোট্ট মেয়ে গর্ত্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে আছে। মঞ্জু অবাক্ হ'য়ে বড় বড় চোখ মেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বল্‌লে,—"তুমি কে?"

মেয়েটি ঠোঁটের একটি করুণ ভঙ্গী ক'রে বল্‌লে,—"আমি পরী।" ব'লে পাখ্‌না মেলে উড়ে এসে মঞ্জুর সাম্‌নে দাঁড়াল'।

মঞ্জু ভারি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল বল্‌লে,—"তুমি উড়্‌তে পার?"

পরী বল্‌লে,—"হ্যাঁ, তুমি বুঝি গর্ত্ত থেকে উঠ্‌তে পারছ না? এস' তোমাকে ওপরে নিয়ে যাই।" ব'লে মঞ্জুর দু'হাত ধ'রে উড়্‌তে উড়্‌তে ওপরে নিয়ে এল'।

তারপর দু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল। দু'জনেই প্রায় সমান—পরী বরং মঞ্জুর চেয়ে একটু খাটো। বনের বড় বড় গাছের তলায় আলো-অন্ধকারের ভেতর দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে মঞ্জুর ভারি আহ্লাদ হ'তে লাগ্‌ল, সে পরীকে জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি কোথা থেকে এলে? এতদিন আসনি কেন?"

দু'জনে একটি ফুলে ভরা লতার নীচে গিয়ে বস্‌ল'। মঞ্জু বল্‌লে,—"তুমি চ'লে গেলে আমি কার সঙ্গে খেলা করব' ?"

পরীরও মঞ্জুকে বড় ভাল লেগেছিল, মঞ্জুকে ছেড়ে যেতে তারও ইচ্ছা হচ্ছিল না ; সে একটু ভেবে বল্‌লে,—আচ্ছা এক কাজ কর'-না, তুমিও আমার সঙ্গে পরীর দেশে চল'-না। সেখানে আমার মতন আরো অনেক খেলার সাথী পাবে।"

মঞ্জু বল্‌লে,—"কিন্তু আমি যে উড়্‌তে পারিনা, চাঁদে যাব' কেমন ক'রে ?"

পরী হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে,—"সে কিছু শক্ত নয় ; আমি এক্ষুণি তোমার ডানা গজিয়ে দিতে পারি, তুমিও আমার মতন পরী হ'য়ে যাবে।"

মঞ্জু ভারি আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে,—"কি ক'রে ?"

পরী বল্‌লে,—"আমি যদি তোমায় চুমু খাই, তা' হ'লেই তুমি পরী হ'য়ে যাবে ; আমার মতন তোমারও পাখ্‌না গজাবে।"

মঞ্জু ভাব্‌লে, পরী ঠাট্টা কর্‌ছে। তাও কি কখনও হয়, মা ত মঞ্জুকে কত চুমু খান, কৈ তার পাখ্‌না গজায় না ত !

সে বল্‌লে—"যাঃ, সে কি হয় !"

পরী বল্‌লে,—"দেখ্‌বে ?"—এই ব'লে লতায় যে সব ফুল ফুটেছিল, তারই একটিতে সে চুমু খেলে। ফুলটি অমনি প্রজাপতি হ'য়ে রঙীন ডানা মেলে উড়ে গেল'।

মঞ্জু অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে রইল'। পরী বল্‌লে,—"দেখ্‌লে ?
—তুমি পরী হবে ?"

মঞ্জু ভাব্‌তে লাগ্‌ল। পরী হবার তার খুব ইচ্ছা, কিন্তু পরী হ'লে যদি মা'র কাছে থাক্‌তে না পায় ! মা তার জন্য কাঁদ্‌বেন—'মঞ্জু মঞ্জু' ব'লে ডাক্‌বেন, আর, সে তাঁর কাছে যেতে পাবে না—এ কষ্ট মঞ্জু কি ক'রে সহ্য করবে ?

সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"পরী হ'লে আমি মা'র কাছে থাক্‌তে পাব' ?"

পরী মাথা নেড়ে বল্‌লে,—"না। তোমাকে তখন পরীর দেশে গিয়ে থাক্‌তে হবে। পরীদের মানুষের সঙ্গে কথা কওয়া মানা। তুমি ছোট্ট মানুষ, তাই আমি তোমার সঙ্গে কথা ক'য়েছি।"

মঞ্জু আবার ভাব্‌তে লাগ্‌ল'। খেলার সাথী পেতে হ'লে মা'কে হারা'তে হয়। কিন্তু মা'কে ছেড়ে সে ত কিছুতেই থাক্‌তে পার্‌বে না। তাই, ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলে সে বল্‌লে,—"না, আমি পরী হব' না ; আমি মার কাছে থাক্‌ব'।"

পরী মুখখানি বিষণ্ণ ক'রে বল্‌লে—"আমরা রোজ রাত্রে চাঁদ উঠ্‌লে এই বনে খেলা কর্‌তে আসি। চাঁদ হচ্ছে আমাদের বাড়ী—সেখানেই আমরা থাকি। কাল রাত্রে খেলা কর্‌তে কর্‌তে আমি একটা লতার ঝোপে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুম ভেঙে, দেখ্‌লুম, চাঁদ অস্ত গিয়েছে আমার সখীরা সব চ'লে গেছে ;

আমি একলাটি বনের মধ্যে প'ড়ে আছি।" পরীর রাঙা রাঙা পাত্‌লা ঠোঁট কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল।

মঞ্জু পরীর গলা জড়িয়ে বল্‌লে,—"আমি তোমার সঙ্গে খেলা করব'—তুমি কেঁদ' না। আমার একটিও খেলার সাথী নেই, আজ থেকে তুমি আমার সাথী হ'লে। সন্ধ্যাবেলা আমরা দু'জনে বাড়ী ফিরে যাব', এক বিছানায় শুয়ে ঘুমুব'—মা তোমায় কত আদর করবেন—তারপর সকালবেলা এখানে এসে আবার আমরা খেলা করব'। কেমন ?"

পরী দুঃখিত ভাবে মাথা নেড়ে বল্‌লে,—"না, আজ রাত্রে চাঁদ উঠ্‌লে আমার সখীরা ফিরে আস্‌বে, তখন আমি তাদের সঙ্গে বাড়ী যাব'।"

মঞ্জুর মুখ ম্লান হ'য়ে গেল'। পরীকে সে অনেক অনুনয় করলে, কিন্তু বাড়ীর জন্যে পরীর মন কেমন কর্‌ছিল, সে থাক্‌তে রাজি হ'ল না।

পরীরও মনে ভারি দুঃখ হ'ল, কিন্তু সে আর কিছু বল্‌লে না। এদিকে সন্ধ্যা হ'য়ে আস্‌ছিল; পরী মঞ্জুর হাত ধ'রে তার বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। যাবার সময় মঞ্জুর ইচ্ছা হ'ল পরীকে একটা চুমু খেয়ে ফেলে; কিন্তু মা'র কথা মনে পড়্‌তেই আর তা পারলে না। বাড়ী যেতে যেতে ছলছল চোখে কেবল পরীর পানে ফিরে ফিরে চাইতে লাগ্‌ল। পরীরও মঞ্জুকে একলাটি ফেলে যেতে ইচ্ছা কর্‌ছিল না, সে বল্‌লে—

"মঞ্জু, যদি পরী হবার ইচ্ছা হয়, চাঁদ উঠ্‌লে বনের মধ্যে যেও।" এই বলে পরী বনে ফিরে গেল।

সেই যে দুষ্টু রূপী-বানরটা,—সে গাছের ওপর থেকে মঞ্জু আর পরীর সব কথা শুনেছিল; আর পরীর চুমুতে ফুল কেমন প্রজাপতি হ'য়ে উড়ে গেল তাও মিট্‌মিট্‌ ক'রে দেখেছিল। তার ভারি লোভ হ'ল পরী হবার জন্যে। কিন্তু পরীর চুমু না পেলে ত আর পরী হওয়া যায় না; তাই সে লুকিয়ে পরীর পিছনে পিছনে ঘুর্‌তে লাগ্‌ল'। তার মৎলব—সুবিধা পেলেই পরীকে চুমু খেয়ে নিজে পরী হ'য়ে যাবে।

পরী মঞ্জুকে পৌঁছে দিয়ে সেই লতার তলায় এসে বস্‌ল'। তখন রূপী এক-পা এক-পা ক'রে তার কাছেএসে বাঁদুরে মুখে হাসি এনে বল্‌লে,—"পরী তোকে আমি বড় ভালবাসি, তুই আমার একটা চুমা খাবি?"

পরীর একেই ত মন খারাপ ছিল, তার ওপর রূপীর এই কথা শুনে তার আরও রাগ হ'ল, সে বল্‌লে,—"দূর হ' দুষ্টু! পাজি কোথাকার" ব'লে মাটি থেকে একটা নুড়ি তুলে নিয়ে তাকে ছুঁড়ে মার্‌লে! রূপী ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে কিচির্‌-মিচির্‌ কর্‌তে কর্‌তে পালিয়ে গেল'।

ক্রমে রাত্রি হ'ল। পূব আকাশে গাছের মাথায় চাঁদ উঠ্‌ল; তখন এক ঝাঁক পরী খেলা কর্‌বার জন্যে চাঁদ থেকে নেমে এল'। তারা 'সুধা সুধা' ক'রে ডেকে ডেকে বনময় খুঁজে বেড়াতে

মঞ্জু একলাটি বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে। সে পা টিপে টিপে ঘরে ঢুক্‌ল'। মঞ্জুর ঘুমন্ত মুখে চাঁদের আলো পড়েছে—সে স্বপ্নে হাসছে; বোধ হয় পরীদের সঙ্গে খেলার স্বপ্ন দেখছে!

সুধা তার বিছানায় ঝুঁকে তার ঠোঁটে একটি চুমু খেলে।

অম্‌নি—আশ্চর্য্য ব্যাপার! মঞ্জু পরী হ'ল না—

সুধার পাখ্‌না দু'টি পিঠ থেকে খ'সে মাটিতে প'ড়ে গেল'। তার চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল'; সে মঞ্জুর পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌ল'। পরী-রাজ্যের কথা আর তার মনে রইল' না। সে পরী ছিল—মঞ্জুর ঠোঁটের পরশ পেয়ে মানুষ হ'য়ে গেল'।

* *

রূপী-বানরটা পরীদের মন্ত্রণা শুনেছিল, তাই সেও সুধার পিছন পিছন এসেছিল। জানালা দিয়ে সে উঁকি মেরে দেখ্‌লে, মঞ্জু আর পরী পাশাপাশি শুয়ে ঘুমুচ্ছে। তার ভারি কৌতূহল হ'ল; সে গুটি গুটি ঘরের মধ্যে ঢুক্‌ল'।

ঘরে ঢুকে দেখলে, পরীর পাখ্‌না দু'টি মাটিতে প'ড়ে আছে। সে ভাব্‌লে,—এই ত ঠিক হয়েছে, আর আমায় পায় কে? এবার আমি পরী হব'।—এই ভেবে পাখনা দু'টি নিজের পিঠে জুড়ে দিলে।

পরীর পাখ্‌না রূপীর পিঠে জুড়ে গেল বটে, কিন্তু সে পরী হ'তে পার্‌লে না। রূপী ভারি দুষ্টু, তাই সে পরীও হ'ল না, রূপী বানরও রইল' না,—বাদুড় হ'য়ে আকাশে উড়ে বেড়াতে লাগ্‌ল'!

ওদিকে পরীরা অনেকক্ষণ সুধার পথ পানে চেয়ে রইল'। কিন্তু সুধা ফির্‌ল' না, তখন, চাঁদ অস্ত যায় দেখে তা'রা সবাই চ'লে গেল।

* * *

অনেক রাত্রে মা মঞ্জুকে দেখ্‌তে এলেন। দেখ্‌লেন, মঞ্জুর পাশে একটি ফুট্‌ফুটে সুন্দর ছোট্ট মেয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

তিনি অনেকক্ষণ তাদের শিয়রে দাঁড়িয়ে তাদের মুখের পানে পানে চেয়ে রইলেন। তারপর, একটু হেসে আস্তে আস্তে দু'জনের কপালে চুমু খেলেন।

রাতের অতিথি

তোমরা জান না,—সে অনেক দিনের কথা, তখন ভারতবর্ষে প্রথম রেল এসেছে। সেই সময় একবার মৃত্যু দেবতার ক্রূর দৃষ্টি এই বাংলাদেশের উপর প'ড়েছিল। দেয়ালীর সময় যেমন পোকা মরে তেম্‌নি মানুষ ম'রে দেশ একেবারে শ্মশান হয়ে গিয়েছিল।

নির্জ্জিত নিস্তেজ জাতির উপর বিধাতার এই ক্রোধ যে মহামারী রূপ ধরে দেখা দেবে এ কেউ কল্পনা করতে পারে নি। শুধু পশ্চিম বাংলায় গঙ্গার ধারের একটি গ্রামে একজন লোক তার ইসারা পেয়েছিল।

গ্রামটি বেশ বর্দ্ধিষ্ণু। মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ এই গ্রামের সবচেয়ে বড় গৃহস্থ। তার ক্ষেত খামার পুকুর বাগান হাল গরু অনেক আছে। গ্রামের সকলে তাকে ভারি শ্রদ্ধা করে। সে ভারি ভাল লোক, —বিষয় বুদ্ধিও যেমন আছে তেমনি শরীরে দয়া মায়ারও অভাব নেই।

সে সময় গ্রামের পাশ দিয়ে রেল লাইন যাবার উঁচু বাঁধ তৈরী হচ্ছিল—হাজার হাজার কুলি তাতে কাজ করত, গ্রামের কাছেই তারা ছাউনি ফেলে থাকত; দিনের বেলায় তাদের কোদাল কুড়ুল গাঁইতির শব্দে চারিদিক চঞ্চল হয়ে উঠত আর রাত্রে

তাদের ছাউনির হাজার হাজার আলো গ্রাম থেকে আলেয়ার মত বোধ হত।

গ্রামের লোকেরা হাঁ করে তাদের কাজ দেখত আর ভাবত, না জানি এসব কি হচ্ছে। রেল তারা কখনো দেখেনি তাই এই উঁচু পাড়ের অর্থ কিছুই আন্দাজ করতে পারত না; কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ বুদ্ধিমান লোক ছিল, সে মাথা নেড়ে বলত, 'এসব ভাল ব্যবস্থা নয়, কোম্পানী মাটি কেটে জাঙ্গাল তৈরী করছে, বর্ষার জল বেরুতে পাবে না; তখন দেশের কি অবস্থা হবে।'

কিন্তু তার কথা কে শুনবে? ক্রমে কুলিরা কাজ করতে করতে এগিয়ে গেল,—পড়ে রইল শুধু তাদের তৈরী লম্বা উঁচু বাঁধটা। তার পাশে পাশে ছোট ছোট গাছে গজাতে সুরু করল, গাঁয়ের ছেলেরা তার উপর উঠে খেলা করতে লাগল। আস্তে আস্তে জিনিষটা সকলেরই গা-সওয়া হয়ে গেল।

এমনি ভাবে চার পাঁচ মাস কেটে গেল।

বৈশাখ মাসে একদিন সন্ধ্যার পর মৃত্যুঞ্জয় নিজের চণ্ডীমণ্ডপে বসে থেলো হুঁকোয় তামাক খাচ্ছিল আর ঝিমচ্ছিল। এক পায়রা মটর প্রমাণ আফিম্ খাওয়া তার অভ্যাস ছিল—তার উপর হুঁকোয় মৃদু মন্দ টান দিতে দিতে মৌতাত বেশ জমে এসেছিল। এমন সময় খট্ খট্ শব্দ শুনে চমকে উঠে মৃত্যুঞ্জয় দেখলে প্রকাণ্ড লম্বা একটা লোক লাঠি হাতে করে সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে

আর চেহারা দেখা গেলনা, মৃত্যুঞ্জয় ভয় পেয়ে বলে উঠল,—কি চাও? কে তুমি?'

'অতিথি।'

অপরিচিত লোকটার গলার আওয়াজ শুনে মৃত্যুঞ্জয়ের হাড়ের ভিতরে মজ্জা পর্য্যন্ত যেন জমে গেল,—এমন আওয়াজ সে জীবনে কখনো শোনেনি। 'তুই থুলি মুই থুলি' পাখীর ডাক শুনেছ? ঠিক সেই রকম আওয়াজ—কাণে গেলেই গা শিউরে ওঠে। মৃত্যুঞ্জয় কোনরকমে হাতের হুঁকোটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করলে,—'কোথা থেকে আসা হচ্চে?

'ওপার থেকে।'

মৃত্যুঞ্জয় মনে করলে গঙ্গার ওপার থেকে। সে তখন চাকর ডেকে আলো আনতে বল্‌লে। অতিথি অভ্যাগত মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ীতে প্রায়ই আসত—কেউ নিরাশ হয়ে ফিরে যেত না, আগন্তুকদের থাকবার জন্যে একটা ঘর ছিল,—তারা যতদিন ইচ্ছা থেকে খাওয়া দাওয়া করে নিজের গন্তব্যস্থানে চলে যেত।

চাকর আলো নিয়ে এল। তখন অতিথির চেহারা খানা দেখা গেল। মাথার উপর মস্ত একটা পাগড়ী তার ল্যাজটা মুখের চারিদিকে এমনভাবে জড়ানো যে মুখের কোনো অংশই দেখা যায়না, শুধু চোখ দুটো যেখানে থাকা উচিৎ সেখান থেকে যেন একটা কালো আভা বেরুচ্ছে। সর্ব্বাঙ্গে একটা কালো চাদর ঢাকা, পায়ে নাগরা জুতো। লাঠিটা যেহাতে ধরে আছে সে হাতের

কব্জি পর্য্যন্ত শুধু দেখা যাচ্ছে—আবলুশের মত কালো! মৃত্যুঞ্জয়ের প্রাণে বড় ভয় হল। এই গ্রীষ্মকালে লোকটা আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে আছে কেন? মুখ দেখাচ্ছে না কেন? চোর ডাকাত নয় ত?

মনে মনে সে এই কথা ভাবছে এমন সময় অতিথি খল্‌খল্ করে হেসে উঠ্‌ল। হাসি শুনে মৃত্যুঞ্জয় চমকে উঠে বললে—'তা বেশ আজ রাত্তিরে এখানেই থাকুন—বসুন এসে। ওরে, হাতমুখ ধোবার জল এনে দে।'

'দরকার নেই। আলোটা নিয়ে যেতে বলুন।'

চাকর আলো নিয়ে চলে গেলে অন্ধকারে লোকটা মৃত্যুঞ্জয়ের পাশে এসে বসল; মৃত্যুঞ্জয়ের গা ছমছম করতে লাগল কিন্তু সে ভাব প্রকাশ না করে মুখে বললে,—'আপনার কোথায় যাওয়া হবে?'

'পূবের দিকে যাচ্ছি।

তারপর দুজনে আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ। এই বৈশাখ মাসের গরমেও মৃত্যুঞ্জয়ের একটু গা শীত শীত করতে লাগল। হুঁকোয় বড় বড় গোটাকয়েক টান দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে,—'তামাক ইচ্ছে করবেন কি? আনিয়ে দেব?'

আবার সেই খল্‌খল্ হাসি! আগন্তুক বললে,—'তামাক' বহুকাল খাইনি। কিন্তু থাক, এ যাত্রা আর কাজ নেই।

এতক্ষণে মৃত্যুঞ্জয়ের মনে পড়ল যে আগন্তুকের নাম জানা হয়নি; সে বললে,—'মশায়ের নামটি কি?'

অতিথি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো, অন্ধকারে মনে হল যেন তার চোখ দিয়ে কালো আগুণ বেরুচ্ছে সে বললে,—'অত খবরে দরকার কি যা বলেছি তাই যথেষ্ট, এখন আমি কোথায় শোব দেখিয়ে দাও অনেক দূর থেকে এসেছি ক্লান্তি বোধ হচ্চে।'

অতিথির এই রূঢ় কথায় মৃত্যুঞ্জয়ের রাগও হল আবার ভয়ও হল। একবার ভাব্‌লে, হয়ত কোনো রাজারাজড়া গোছের বড় লোক ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাই পরিচয় দিতে চায় না যা হোক, সে বল্‌লে,—'কিন্তু আহারাদি করবেন না?'

'না, আমার পেটের ক্ষিদে তোমরা মেটাতে পারবে না। আবার যখন আসব তখন হবে।'

অতিথির কথার মানে মৃত্যুঞ্জয় কিছুই বুঝতে পারলে না, কিন্তু তবু বাড়ীতে অভুক্ত অতিথি থাকলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। তাই সে আবার বললে,—'কিন্তু, অনেক দূর থেকে আসছেন বললেন, ক্লান্তও হয়েছেন,—একটু কিছু আহার করে শুলে হত না?' অতিথি অধীর ভাবে বললে—'না কোথায় শোব দেখিয়ে দাও।' মৃত্যুঞ্জয় তখন তাকে শোবার ঘর দেখিয়ে দিলে। অতিথি ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে; তারপর আর তার কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

নানারকম দুর্ভাবনা মৃত্যুঞ্জয়ের মনে আনাগোনা করতে লাগল। লোকটা কে! যদি ভাল লোকই হবে তবে অমন মুখ ঢাকা দিয়ে বেড়ায় কেন? লোকটার গলার আওয়াজ কি ভয়ঙ্কর—

শুনলেই গা কেঁপে ওঠে আর গায়ের রঙ্ কি কালো। শুধু একটা হাত দেখতে পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু সেটা যেন আলকাৎরার মত! যদি সত্যিই ডাকাত কি বদমায়েস হয় তাহলে উপায়!

মৃত্যুঞ্জয় বাড়ীর ভিতর গিয়ে চাকর বাকরকে সাবধান করে দিলে, যেন তারা রাত্রে সতর্ক থাকে। আর নিজে ঠিক করলে ওই অজ্ঞাত অতিথির গতিবিধির উপর নজর রাখ্‌বে। মনে মনে এই সঙ্কল্প এঁটে সে রাত্রির মত খাওয়া দাওয়া শেষ করে আবার চণ্ডীমণ্ডপে এসে বসল। বাড়ীতে একটা বহুকালের পুরোনো মরচেধরা তলোয়ার ছিল সেইটে সঙ্গে রইল।

চণ্ডীমণ্ডপ থেকে বিশহাত দূরে অতিথির ঘর—সেখান থেকে টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত অস্‌ছে না। এদিকে চণ্ডীমণ্ডপে বসে মৃত্যুঞ্জয় ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক টানছে আর মাঝে মাঝে চোখ টেনে অতিথির ঘরের দিকে চাইছে। ক্রমে রাত্রি বেড়ে চল্‌ল, গ্রাম একেবারে নিশুতি হয়ে গেল। কৃষ্ণপক্ষের আকাশে বড় বড় তারাগুলো দপ্‌দপ্ করে জ্বল্‌তে লাগল।

একবার মৃত্যুঞ্জয় পা টিপে টিপে উঠে অতিথির দরজায় আড়িপেতে শোনবার চেষ্ট করলে অতিথি জেগে আছে কিনা। কিন্তু কোনো শব্দই সে পেলেনা—এমন কি অতিথির নাক ডাকার শব্দ পর্য্যন্ত নয়! তখন সে ফিরে এসে আবার তামাক সেজে টানতে লাগল। এমনি ভাবে রাত দুপুর পার হয়ে গেল।

হুঁকো হাতে করেই মৃত্যুঞ্জয় ঝিমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কিসের শব্দে চটকা ভেঙে চোখ চেয়ে দেখলে আকাশে হলুদ রঙের একটুকরো চাঁদ উঠেছে—তারি আলোতে বাইরের প্রকৃতি অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। শব্দটা কোন্ দিক থেকে এল সে ধরতে পারেনি, তাই কান খাড়া করে রইল। কিছুক্ষণ বাদে খুট্ করে আবার শব্দ হল। যেন কে খুব সন্তর্পণে অতিথির ঘরের দরজা খুলছে। মৃত্যুঞ্জয় নিঃশব্দে হাতের হুঁকো নামিয়ে রেখে সেইদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

কিছুক্ষণ আবার নিস্তব্ধ! তারপর অতিথির ঘরের দরজা দিয়ে একটা মূর্ত্তি বেরিয়ে এল! চাঁদের আবছায়া আলোতে তার চেহারা দেখে মৃত্যুঞ্জয়ের বুকের স্পন্দন যেন হোঁচট্ খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েই আবার উন্মত্ত বেগে ছুটতে আরম্ভ করল। সে দেখলে,—মানুষ নয়, একটা আস্ত মানুষের কঙ্কাল উলঙ্গ হয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তার হাড়গুলো শাদা নয়—কুচ্‌কুচে কালো। পাঁজরার ভিতর দিয়ে এপার ওপার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—আর তার হাতে সেই লম্বা লাঠিটা।

চণ্ডীমণ্ডপের অন্ধকারে বসে মৃত্যুঞ্জয় অষ্টমীর পাঁটার মত কাঁপতে লাগল। কঙ্কালটা একবার ঘাড় বেঁকিয়ে সেই দিকে ফিরে দেখলে—তার মাংসহীন মুখে সারি সারি দাঁতগুলো চাঁদের আলোয় বিকট হাসির মত মনে হল। তারপর সে উঠান পার হয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

তার মূর্ত্তিটা বাইরে মিলিয়ে যেতেই মৃতুঞ্জয় ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো। চেঁচামেচি করে লোকজন জড় করবার ক্ষমতা ছিলনা, গলা শুকিয়ে একেবারে কাট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওই কঙ্কালটা কোথায় গেল জানবার অদম্য কৌতূহল তাকে পেয়ে বসল। ভয়ে হাত পা পেটের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে অথচ কঙ্কালের পিছন পিছন যাবার ইচ্ছা—এ এক আশ্চর্য্য মনের অবস্থা। বাঘের পিছু পিছু যখন কেউ ঘুরে বেড়ায় তখন তাদের মনের ভাব ও বোধহয় ওই রকম হয়।

মৃত্যুঞ্জয় বেরিয়ে পড়ল। বাইরে এসে দেখলে কঙ্কালটা লাঠি কাঁধে করে অনেকদূরে এগিয়ে চলেছে। সেও সেইদিকে চলল। ক্রমে কঙ্কাল শ্মশান ঘাটে গিয়ে পৌঁছুলো। মৃত্যুঞ্জয় তখন একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দূর থেকে তার কার্য্যকলাপ দেখতে লাগ্‌ল।

শ্মশানে অনেক ভাঙা কলসী আর মড়ার হাড়গোড় পড়ে ছিল। চিতা জল দিয়ে নিভিয়ে দেবার পর যেমন সেখানে একটা লম্বা গর্ত্ত হয়ে যায়, সেইরকম একটা যায়গায় কঙ্কালটা গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর কাঁধ থেকে লাঠিটা নামিয়ে তার মুণ্ডটা সেই গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে লাঠির মুণ্ডটা দপ্ করে জ্বলে উঠ্‌ল। তখন পৈশাচিক অট্টহাসির মত একটা চিৎকার করে কঙ্কালটা সেই জ্বলন্ত লাঠি কাঁধে ফেলে দৌড়ুতে আরম্ভ করলে।

মৃত্যুঞ্জয়ও মন্ত্রমুগ্ধের মত তার পিছনে ছুটতে লাগল। তখন

তার আর বাহ্যজ্ঞান নেই,—স্বপ্নে যেমন নিজের দেহ মনের উপর কোনো অধিকার থাকেনা তেমনি অসহায় ভাবে সে কঙ্কালকে অনুসরণ করে ছুটে চল্‌ল।

লাঠির আগাতে আগুণ জ্বলছিল বটে কিন্তু' তা থেকে আলোর চেয়ে ধোঁয়াই বেশী বার হচ্ছিল। মৃত্যুঞ্জয় দেখ্‌লে,—ধোঁয়াটাও ঠিক যেন ধোঁয়া নয়, যেন রাশি রাশি কালো পোকা বেরিয়ে চারিদিকের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। যেন অগণ্য অসংখ্য মশা সেই আগুণে জন্মগ্রহণ করে আকাশ ছেয়ে ফেল্‌ছে।

শ্মশান থেকে বেরিয়ে রেলের বাঁধের উপর উঠে কঙ্কালটা ছুটতে লাগল আর এক অপার্থিব হাসি হাসতে লাগল। যেন সে হাসি অন্যান্য অশরীরী সঙ্গীদের ডেকে বল্‌ছে—আয় আয় মানুষের রক্ত শুষে খাবি ত আয়! হাহা! বড় মজা! শিগ্‌গির আয়! শিগ্‌গির আয়!

রেলের পাড়ের উপর উঠে মৃত্যুঞ্জয় দেখলে—তার বাড়ীর দিকটাতে যেন অনেক আলো জ্বলছে, সেদিকটা রাঙা হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে কথা ভাববার তার সময় ছিলনা, সে অন্ধভাবে কঙ্কালের পিছনে ছুটে চল্‌ল।

কঙ্কাল সমস্ত গ্রামটাকে একবার প্রদক্ষিণ করলে। তারপর মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ীর কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ীতে আগুণ লেগেছে,—সমস্ত বাড়ীখানা দাউ দাউ করে জ্বলছে।

কঙ্কাল তার হাতের জ্বলন্ত লাঠিটা সেই আগুনের মধ্যে ফেলে দিলে। তারপর হঠাৎ ফিরে গিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের সামনে দাঁড়োলো।

মৃত্যুঞ্জয়ের প্রাণে আর তখন ভয় ছিলনা, সে কঙ্কালকে জিজ্ঞাসা করলে 'তুমি কে ?'

কঙ্কাল খলখল্ করে হেসে বললে, 'কে আমি ? আমি অগ্রদূত আমার সঙ্গীরা সব আসছে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আসছে। বাংলাদেশ ছেয়ে যাবে—ঘরে ঘরে মড়া কান্না উঠবে ...পর চিতায় দেবার লোকও থাকবেনা—ঘরে ঘরে পচা মড়া ...ড় থাকবে। রাস্তায় শেয়াল কুকুর মড়া নিয়ে ছেঁড়া ছিঁড়ি ...রবে। হাঃ হাঃ হাঃ ! আসছে—তারা আসছে ! আমি যাই —এগিয়ে চলি ! আরো এগিয়ে চলি !'—এই পর্য্যন্ত বলে কঙ্কাল যেন হঠাৎ হাওয়ায় মিশিয়ে গেল।

পূর্ব্বদিক তখন ফর্সা হয়ে আস্‌ছে। মৃত্যুঞ্জয় সেইদিকে তাকিয়ে দেখলে,—মনে হল যেন ধোঁয়ার মত প্রকাণ্ড একঝাঁক মশা সঙ্গে করে নিয়ে লম্বা পা ফেলে কঙ্কালটা পূবদিকে এগিয়ে চলেছে।

এতক্ষণ পরে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

গাঁয়ের লোক এসে মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ীর আগুন নেভাবার চেষ্টা করলে ; কিন্তু আগুণ নেভানো গেলনা—বাড়ী একেবারে ছাই হয়ে গেল।

মূর্চ্ছা ভেঙে উঠে মৃত্যুঞ্জয় পাগলের মত এদিক ওদিক তাকাতে

তাকাতে সবকথা বললে। তার গল্প শুনে গাঁয়ের লোকেরা মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল। তারপর যে-যার বাড়ী ফিরে গিয়ে এই কথাটাই আলোচনা করতে লাগল যে কাল রাত্রে মৃত্যুঞ্জয়ের আফিমের মাত্রা নিশ্চয় এক মটর থেকে দু'মটরে উঠেছিল।